সত্যের আলো

মোঃ নূরে আলম

যাহ্‌রা একাডেমী
ক্বোম, ইরান

সত্যের আলো

মোঃ নূরে আলম

প্রকাশক: যাহরা একাডেমী, ক্বোম, ইরান

প্রকাশকাল:

ভাদ্র, ১৪০৭ বাংলা

সেপ্টেম্বর, ২০০০খ্রী.

জামাদিউস সানি, ১৪২১ হিঃ

কম্পোজ: আশরাফ- উল- আলম

অবতরনিকা

সর্বশক্তিমান মহান স্রষ্টা আল্লাহর কৃপা ও দয়ার অন্ত নেই । তিনি আর- হামুররাহিমিন ।তার অপার মহিমায় সৃষ্টিকুলের সকল কিছু গতিশীল । তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তার ক্ষমতার পরিধি নিরূপন করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে, কোন কালে । যখন কেউ ছিলো না তখনও তিনি ছিলেন আবার যখন সকল অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে তখনও তিনি থাকবেন অস্তিত্বমান ।

সমস্ত প্রশংসা ও নমনীয়তা সেই মহান শক্তিধর প্রভূর জন্যে, যার গুনাবলী ও জাতসত্বার মাঝে কোন পার্থক্য করা যায় না ।

অসংখ্য দরূদ ও সালাম তার প্রেরীত মহাপুরুষদের উপর, আদি পিতা আদম থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এবং তার আহলে বাইতের উপর, ক্বিয়ামতপূর্বে আগমনকারী, ভূপৃষ্ঠ থেকে যুলুম- অত্যাচার বিলুপ্তকারী ইমাম মাহদী (আ.) পর্যন্ত ।

বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ । এ দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ সুন্নী মুসলমান । হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত হিসেবে দাবী করে থাকলেও তার আহলে বাইত সম্পর্কে আমরা অনেকেই অজ্ঞাত । আবার অনেক জ্ঞানী ব্যাক্তিবর্গ আহলে বাইতের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় অনিচ্ছুক । কেননা প্রতিষ্ঠিত স্বার্থান্বেষী ও তাবেদার সরকারী ফতোয়াবাজ আলেমদের ফতোয়ার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় । ফলে সমাজে আহলে বাইতের সঠিক পরিচয় আজো ইসলামী সাহিত্যিক ও লেখক মহলের গন্ডি বহির্ভূত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । যদিও অনেকে এ বিষয়ে লেখার চেষ্টা করেছেন, তাদের অনেকেই ধর্মীয় গোড়ামী ও সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে উঠে আহলে বাইতের সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে অপারগ হয়েছেন । আবার অনেকে কিছু লেখালেখি করলেও ভোগবাদী তথাকথিত আলেমদের অপপ্রচারের রোষানলে পতিত হবার কারণে তা নিতান্তই অসহায় ।

এ পুস্তকটির উদ্ধৃতিসমূহ মূলতঃ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত গ্রন্থাবলী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে । পুস্তকটিতে উল্লেখিত সিহাহ সিত্তাহ, মাসানিদ ও ইতিহাস গ্রন্থাবলীর

সব ক ' টি আহলে সুন্নাত কর্তৃক গৃহীত ও সম্মানিত । আমাদের সমাজে এ ধরনের উদ্ধৃতিবহুল গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ বইটি লেখা হয়েছে ।

এ বইটিতে আবেগ ও গতানুগতিক ধর্মীয় গোড়ামীর কোন স্থান দেয়া হয়নি । অনুরূপভাবে সব ধরনের ধর্মীয় স্পর্শকাতর শব্দ চয়ন, শিরোনাম ও বিবরণ থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকার চেষ্টা করা হয়েছে ।

এ পুস্তকের উদ্ধৃতি সংগ্রহে যিনি সার্বক্ষণিকভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হচ্ছেন বাগদাদ নগরীর অধিবাসী, বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও হাওযা- এ- ইলমিয়া ক্বোমের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা শেখ আস সামী আল- গুরাইরী । এ জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি । সাথে সাথে আমার এ কাজে উৎসাহ- উদ্দীপনা ও আন্তরিক সহযোগীতার জন্য সম্মানিত যাহরা একাডেমীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাও যুক্তিযুক্ত মনে করছি ।

নবী করিম (সা.) এর আহলে বাইতের সত্য ও সঠিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র । 'সত্যের আলো ' প্রতিটি পাঠক মহলের জ্ঞান বৃদ্ধি ও সঠিক পথ অবলম্বনে সামান্য উপকারে আসলেও নিজেকে ধন্য মনে করবো ।

মোঃ নূরে আলম

মানব জীবনে নেতার গুরুত্ব

পবিত্র আল কোরআনে আল্লাহ বলেন,

(يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ)

অর্থাৎঃ- "ক্বিয়ামতের দিবসে প্রত্যেক জনগোষ্ঠিকে তাদের ইমামদের সাথে ডাকা হবে ।"[১]

মানব জীবনে নেতা বা পরিচালকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ববহ । মানুষ প্রতিনিয়ত তার বৈষয়ীক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কোন না কোন অবলম্বন ধারণ করে থাকে । মানব জীবনে নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না । আর এ গুরুত্ব অনুধাবন করেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন,

"তোমাদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি একত্রে অবস্থান করলে একজনকে আমীর বা নেতা বানিয়ে নাও।"[২]

যেহতেু ইসলাম এসেছে মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে তাই ইহজগতে মানবতার শান্তি ও কল্যাণ এবং পরকালে সৌভাগ্য ও মুক্তির কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষনা দেয়া হয়েছে আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে । আল কোরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ঐ সব লোকদের প্রশংসা করেছেন, যারা বলেন,

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

অর্থাৎঃ হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে এ জগতে মঙ্গল দান কর আর দান কর পরজগতে ।[৩]

মুসাফিরদের জন্যে তাদের ভ্রমন কাজ সুষ্ঠ পরিচালনার জন্যে মহানবীর এ শাশ্বত নির্দেশ এটাই প্রমান করে যে, মুসলমানদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় কর্মকান্ড সঠিক খাতে প্রবাহিত এবং সুষ্ঠ পরিচালনার লক্ষ্যে একজন আমীর বা নেতার প্রয়োজনীয়তা ভ্রমনকালের নেতৃত্বের চেয়েও অধিক

গুরুত্বপূর্ণ । মহাপ্রভূ আমাদের ইহলৌকিক শান্তি ও কল্যাণ এবং পারলৌকিক চিরস্থায়ী মুক্তির জন্যে এমন অবলম্বন ও নেতৃত্বের সন্ধান দিবেন যারা সমস্ত পাপ- পংকিলতা থেকে থাকবেন মুক্ত, ঐশ্বরীক গুনাবলীতে হবেন পরিপূর্ণ এটাইতো প্রভূত্বের দাবী । আর তাই তিনি বান্দাদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত মহাপুরুষদের প্রেরণ করেছেন বিভিন্ন সময়ে ।

তিনি আল কোরআনে বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)

অর্থাৎঃ নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের বুকে আদম ও নূহ এবং ইব্রাহিমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে নির্বাচিত করেছেন ।[৪]

আল্লাহ আল কোরআনে অন্যত্র আরো বলেন,

(إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)

অর্থাৎঃ (হে নবী) নিশ্চয় তুমি (মানুষের জন্যে) ভয় প্রদর্শনকারী, আর প্রতিটি জাতির জন্যে পথ প্রদর্শনকারী বিদ্যমান ।[৫]

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরব জাহেলিয়াতের যুগে আল্লাহর অহি বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত করেছেন । তৎকালীন অশান্ত আরবদেশে মানুষ ইসলামের পরশ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে পেয়েছিল । তারা যখন ধ্বংসের অতল গহ্বরের সন্নিকটে পৌছে গিয়েছিল, যখন তারা আপন কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিত তখন ইসলামের শাশ্বত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে অল্প দিনের মধ্যে তদানিন্তন বিশ্বের দুই পরাশক্তি তথা পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছিল ।

আল্লাহ তাআলা সে অবস্থার বর্ণনা আল- কোরআনে এভাবে দিচ্ছেন,

(وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا)

অর্থাৎঃ স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতকে, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের অন্তরসমূহকে কাছাকাছি এনে দিয়েছেন ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলে এবং তোমরা অগ্নিকুন্ডের পার্শ্বে অবস্থান করছিলে, তিনি সেখান থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন ।[৬]

ইসলামের ইমারত শেষ নবীর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । তিনিই পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলামের প্রবর্তক । আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের কারণেই মানুষ মহানবীর ন্যায় পরশ পাথরের ছোয়া পেয়ে ধন্য হয়েছিল । তার অন্তর্ধানের পর কোন মতে এ দয়া ও অনুগ্রহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেনা মানবজাতির মধ্যে থেকে, এটাও মহানুভব প্রভুত্বের দাবী ।

নবুয়্যত ও রেসালাতের ধারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে । আল্লাহর এ মনোনীত দ্বীন ক্বিয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে । এ ব্যাপারে সমস্ত মুসলমান ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন । তাই স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে, নবী যে দ্বীনের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করলেন অক্লান্ত পরিশ্রম, চরম আত্মত্যাগ ও জেহাদ এবং বহু শহীদের প্রাণের বিনিময়ে, তার সংরক্ষনের জন্যে কি কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যাবেন না ? যিনি অবিকল তার মতই হবেন সমস্ত নেক গুনাবলীতে, যিনি মুহাম্মদী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ সংরক্ষন করে রাখবেন দ্বীন ইসলাম ও কোরআনকে ?

নিশ্চয় আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তার পবিত্র দ্বীন ইসলাম সংরক্ষনের জন্যে এমন ব্যক্তিবর্গকে নিয়োজিত রেখেছেন যারা আল- কোরআনের ন্যায় পবিত্র, যাদেরকে আল্লাহ নিজেই সমস্ত পাপ- পংকিলতা থেকে মুক্ত রেখেছেন ।

পবিত্র আর কোরআনে আল্লাহ তায়ারা বলেন,

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

অর্থাৎঃ- আল্লাহ মনস্থ করলেন তোমাদেরকে কাছ থেকে সমস্ত পাপ- পংকিলতা দূরে রাখতে হে আহলে বাইত এবং মনস্থ করলেন তোমাদেরকে পুত- পবিত্র ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করতে ।[৭]

আল্লাহ তার পবিত্র দ্বীন ইসলামকে অপবিত্র কোন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত অথবা সংরক্ষন করতে পারেন না । সুতরাং নিঃসন্দেহে শেষ নবীর পর কোরআনে উল্লেখিত ঐ সব পবিত্র মহা-পুরুষরাই হবেন দ্বীন ইসলামের সংরক্ষক, রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়নকারী এবং কোরআনের সঠিক ও সহিহ অর্থ- ব্যাখ্যাদানকারী । আল কোরআনে উল্লেখিত "আহলুল বাইত" –এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং তারা কারা এ সমস্ত বিষয়ে আমাদের নিকট নবী কর্তৃক সহি হাদীস দ্বরা প্রমাণিত যে, তারা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ইবনে আলী এবং হযরত হুসাইন ইবনে আলী এবং হুসাইনের বংশধর থেকে পরবর্তী নয়জন ইমাম । আমাদের পরবর্তী আলোচনা সেদিকেই দিক নির্দেশনা দিচ্ছে ।

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরলোকগমণের পর সাহাবীগণ কর্তৃক প্রথম খলিফা হিসাবে হযরত আবু বকরের নিয়োগ এবং তার পক্ষে বাইয়াত গ্রহণকে কোনক্রমে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাবেনা।

বনি সকিফা নামক স্থান খলিফা নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী সকল সাহাবাদের রায় স্বস্থানে সম্মানের দাবী রাখে।

তবে প্রশ্ন হলো রাসূলের (সা.) খেলাফতের পদটি কি কোন বৈষয়িক ব্যাপার নাকি ঐশ্বরীক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত ? দ্বীন ইসলাম মানবতার উভয় জগতের শান্তি ও মুক্তির বার্তা নিয়ে আগমন করেছে । তাই এ পদটিও নিশ্চয় একাধারে বৈষয়ীক ও ধর্মীয়- আধ্যাত্মিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত।

যখন সামান্য বৈষয়ীক ব্যাপারে মানুষ ভূল করতে পারে সেক্ষেত্রে এতবড় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা নির্বাচন কোনক্রমেই ভূলের উর্ধে হতে পারে না ।

তর্কের খাতিরে যদিও বা মেনে নেই যে সাহাবীদের নির্বাচন সঠিক হয়েছে এবং খলিফা নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে মদীনার কতিপয় সাহাবীদের নির্বাচন অন্যকথায় জনগন কর্তৃক নির্বাচন । কিন্তু এ ব্যাপারে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উত্থাপন হতে পারে তা হচ্ছে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা তো জনগন কর্তৃক নির্বাচিত হননি, তাহলে তারা খলিফা হবেন কি করে ?

হযরত ওমর মনোনয়ন পেয়েছেন হযরত আবুবকরের কাছ থেকে, হযরত ওসমান খলিফা হয়েছেন হযরত ওমর কর্তৃক নির্ধারিত ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটা বোর্ডের মাধ্যমে, আর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব খেলাফত লাভ করেছেন গন- বিপ্লবের মাধ্যমে। চার খলিফা চার পদ্ধতিতে খেলাফত লাভ করেছেন, তাহলে কি খলিফা নির্বাচনে ইসলামে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই ? আর যদি বলা হয় হযরত আবু বকর গনভোটে নির্বাচিত খলিফা হিসাবে তার মনোনয়ন অনুযায়ী হযরত ওমরের খেলাফত বৈধ হয়েছে, তাহলে আবারো প্রশ্ন হতে পারে, এ কাজটি কি রাসূল (সা.) করে যেতে পারতেন না ? যখন নির্বাচনের উপর কেউ আপত্তি তোলে তখন

তাকে বলা হয় ‘মহানবী (সা.) খেলাফতের ভার উম্মতের উপর ছেড়ে গিয়েছেন’ । তাহলে হযরত আবু বকর কি নবীজীর পদাংক অনুসরণ করে খেলাফতের ভার উম্মতের উপর ছেড়ে যেতে পারতেন না ? এর জটিলতার গিট উম্মুক্ত করে দিতে পারে আমাদের পরবর্তী আলোচনা ।

নবী) সা (.এর উত্তরাধীকার

প্রকৃতপক্ষে উম্মতের কান্ডারী দয়াল নবী নিশ্চয়ই হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমানের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীদের চেয়েও বেশী জ্ঞান রাখতেন। তিনি সকল জ্ঞানের আধার। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের এর মস্তিস্কে এ চিন্তা আসতে পারলো যে, উম্মতের জন্য পরবর্তী খলিফা নিয়োগ করে যেতে হবে। আর বিশ্বনবীর (সা.) মস্তিস্কে এ বিষয়ে চিন্তার উদ্রেক হবে না এটা কোন সুস্থ বিবেকবান ধার্মীক মুসলমান কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিতে পারেন না । নভী (সা.) হলেন সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ট মহা- মানব । তিনি নিশ্চয়ই অন্যান্য সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী । তাই তো তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে দ্বাযিত্ব প্রাপ্ত ছিলেন । তিনি নিঃসন্দেহে তার উম্মতের হেদায়েতের জন্যে কাউকে নিয়োগ করে গেছেন ।

আল কোরআন ও হাদীসে নববী থেকে খেলাফতের উত্তরাধীকার সম্পর্কিত প্রমাণ পেশ করার পূর্বে বিবেকবান ব্যক্তিদের কাছে সামান্য বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি ।

ধরুন আপনাকে বলা হল আপনার এলাকার সমস্যাবলী তুলে ধরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে একটি সুন্দর পত্র প্রেরণ করতে হবে যাতে তার কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয় । আপনার সামনে চারটি কাগজ রাখা আছে । প্রথম কাগজটির উপরিভাগ কালিমাখা ও আকাবাকা অনেক দাগে ভরপুর আর নিচের অংশ পরিস্কার । দ্বিতীয় কাগজের নিচের অংশ ময়লা ও কালিমাখা আর উপরের অংশ পরিস্কার । তৃতীয় কাগজটির সম্পূর্ণটাই কালো আর আর বহু আকাবাকা দাগ । আর চতুর্থ কাগজটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিস্কার- পরিচ্ছন্ন, দাগের লেশ মাত্র নেই, সুন্দর একখানা কাগজ । আপনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি লেখার জন্য কোন ধরণের কাগজটি নির্বাচন করবেন ? নিশ্চয়ই প্রতিটি রুচিশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে চতুর্থ প্রকার কাগজে চিঠি লেখাটাই হবে সর্বোত্তম কাজ ।

তাহলে বলুন নবী (সা.) এর এ মহাসম্মানিত খেলাফতের পদে নির্বাচনের জন্যে আপনি কি এমন কোন সাহাবীকে নির্বাচন করবেন যার কাজ কর্ম, চিন্তা- ধারায় ইসলাম পূর্ব কালে বহু কালিমা বিদ্যমান ছিল ? নাকি এমন কোন ব্যক্তিকে, যিনি ইসলাম পূরর্বকালে খুব ভাল লোক ছিলেন কিন্তু ইসলামের সুমহান আদর্শে নিজেকে আলোকিত করতে পারেন নি ? আর যার সবটুকুই অন্ধকারে নিমজ্জিত তাকে তো কোন মতে কেউ এ সম্মানিত পদের জন্যে নির্বাচন করবেন না । তাকেই নির্বাচন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যার জীবনে সামান্য পরিমান কালিমা পড়েনি । যিনি এক মূহুর্তের জন্যেও শেরক করেন নি । যিনি বাল্যকাল থেকে মহানবীর (সা.) পবিত্র কোলে লালিত- পালিত হয়েছেন । যার জ্ঞানের তোরণ অতিক্রম করে মহানবীর জ্ঞানের মহানগরীতে পদার্পন করতে হয় ।

নবীজী (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

انا مدينة العلم و علی بابها

অর্থাৎঃ আমি হলাম জ্ঞানের নগরী আর আলী হচ্ছে তার দরজা ।[৮]

নবী (সা.) ও তার পরবর্তী উত্তরাধীকার নির্বাচনের প্রতি দিক- নির্দেশনার লক্ষ্যে আল কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে ।

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

অর্থাৎঃ- আল্লাহ মনস্থ করলেন তোমাদেরকে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে হে আহলে বাইত এবং মনস্থ করলেন তোমাদেরকে পুত- পবিত্র করতে ।[৯]

নবীর আহলে বাইতের ভালবাসা

আল্লামা যামাখশারী ও আল্লামা ফাখরে রাযী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রখ্যাত দু'জন তাফসীরকারক ও বিজ্ঞ আলেম । তারা তাদের সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থদ্বয় 'আল- কাশশাফ' ও 'আল- কাবির'- এ এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, যখন নাযিল হলো এ আয়াতঃ

(قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ)

অর্থাৎঃ (হে রাসূল) বলে দাওঃ আমি আমার রেসালতের বিনিময়ে কোন পার্থিব প্রতিদান ও পারিশ্রমিক চাই না । আমি চাই যে, শুধুমাত্র তোমরা আমার নিকটতম লোকদের (আহলে বাইতকে) ভালবাসবে ।[১০]

তখন রাসূল (সা.) বলেনঃ

من مات على حب آل مُحَمَّد مات شهيدا

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات مغفورا له

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات تائبا

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات مؤمنا مستكملا للايمان

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات بشره ملک الموت بالجنة ثم منكر و نكير

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات يزف الى الجنة كما تزف العروس الى بيت زوجها

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات فتح له فى قبربابان الى الجنة

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات جعل الله قبره مزار ملائكه الرحمن

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات مات على السنة و الجماعة

الا من مات على حب آل مُحَمَّد مات جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينه آيس من رحمه الله

الا من مات على بغض آل مُحَمَّد مات كافرا

الا من مات على بغض آل مُحَمَّد مات لم يشم رائحة الجنّة

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি অন্তরে মুহাম্মদ (সা.) এর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে মৃত্যুবরন করলো তার মৃত্যু শহীদের মৃত্যুর সমতুল্য ।

জেনে রেখোঃ যে ব্যাক্তি হৃদয়ের মাঝে আলে মুহাম্মদের (সা.) প্রতি ভালবাসা লালন করে মৃত্যুবরন করলো তার মৃত্যু ক্ষমা প্রাপ্তির মৃত্যু হিসেবে পরিগনিত ।

মনে রেখোঃ যে ব্যক্তি আহলে বাইতের ভালবাসা অন্তরে নিয়ে মৃত্যু বরন করলো তার মৃত্যু "তওবাকারীর মৃত্যু" হিসাবে গন্য ।

স্মরণ রেখোঃ যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদকে (সা.) ভালবেসে মৃত্যুবরন করলো সে পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে মৃত্যুবরন করলো ।

জেনে রেখোঃ যে ব্যক্তি হৃদয়ে আলে মুহাম্মদের (সা.) ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরন করলো তাকে মৃত্যুদূত তথা আযরাইল (আ.) অতঃপর মুনকির নাকিরও জান্নাতের সুসংবাদ পরিবেশন করবেন ।

স্মরণ রেখোঃ যে ব্যক্তি হৃদয়ে মুহাম্মদ (সা.) এর আহলে বাইতের ভালবাসা লালন করে মৃত্যুবরন করলো তাকে বেহেশ্তে এমনভাবে সজ্জিত করে নিয়ে যাওয়া হবে যেমনিভাবে নববধুকে সাজিয়ে স্বামীগৃহে নিয়ে যাওয়া হয় ।

মনে রেখোঃ যে ব্যক্তি মনের মাঝে আলে মুহাম্মদ (সা.) এর ভালবাসা নিয়ে মৃত্যুবরন করলো তার কবরে জান্নাত মুখী দু'টি দরজা খুলে দেয়া হবে ।

জেনে রেখোঃ যে ব্যক্তি রাসূলের (সা.) আহলে বাইতকে ভালবেসে মৃত্যুবরন করলো মহান আল্লাহ তার কবরকে রহমতের ফেরেস্তাদের জিয়ারতগাহে পরিণত করবেন ।

স্মরণ রেখোঃ যে ব্যক্তি আলে মুহাম্মদ (সা.) কে ভালবেসে মৃত্যুবরন করলো সে রাসূলের সুন্নাতের পথে এবং মুসলমানদের দলভূক্ত হয়ে মৃত্যুবরন করলো ।

মনে রেখোঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) এর আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পেষণ করে মারা যায় সে ক্বিয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার কপালে লিখা থাকবে 'আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত' ।

স্মরন রেখোঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) এর আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে মৃত্যুবরন করলো তার মৃত্যু কাফেরের মৃত্যুর সমতুল্য ।

জেনে রেখোঃ যে ব্যক্তি রাসূলের (সা.) আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণ করে মারা যায় সে কখনো বেহেশ্তের সুঘ্রাণ পাবে না ।[১১]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চার ইমামের অন্যতম, ইমাম শাফেয়ী আহলে বাইতের শানে নিম্নলিখিতরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন । তিনি কবিতা আবৃতি করেছেন এভাবেঃ

يَا آلَ بَيتِ رَسولِ الله حُبُّكُمْ   فَرضٌ مِنَ الله فى القُرآنِ أنزَلَهُ

يكَفيكُم مِن عظيمِ القَدرِ أنّكُم   مَن لَم يُصلِّ عَلَيكُم لَا صَلَاةَ لَهُ

وَ لَمَّا رَأيتُ النَّاسَ قَد ذَهَبَت بِهِم   وَ هُم آل بَيتِ المصطفَى خَاتَمِ الرُّسُلِ

رَكِبتُ عَلَى اسمِ الله فِى سُفُنِ النَّجَا   فَرضٌ مِنَ الله فى القُرآنِ أنزَلَهُ

وَ أمسَكتُ حَبلَ اللهِ وَ هُوَ وَلاءوهُم   كَما قَد أُمِرنَا بالتَمسُّكِ بالحَبلِ

অর্থাৎঃ ‘হে আল্লাহর রাসূলের আহলে বাইত, আপনাদের ভালবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ করা হয়েছে, যা কোরআনের উল্লেখ আছে ।

আপনাদের শ্রেষ্ঠ গৌরবের জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, যে ব্যক্তি নামাজে আপনাদের উপর দরুদ পাঠ করে না তাদের নামাজই হয় না ।

যখন লোকজনদের দেখেছি তারা তাদের পথকে গোমরাহীর সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখন আমি আল্লাহর নামে উঠে পড়লাম আহলে বাইতে মোস্তফার নাজাতের তরীতে ।

আল্লাহর রশ্মি আকড়ে ধরেছি যা হচ্ছে তাদের প্রতি ভালবাসা কেননা এ রশ্মিকে আকড়ে ধরে থাকার দেয়া হয়েছে নির্দেশ ।[১২]

ইমাম শাফেয়ী রাসূলের সেই হাদীসেরই সমর্থন করেছেন যেখানে মহানবী (সা.) বলেছেন,

اهل بيتى كسفينة نوح فمن ركبها نجى و من تخلف عنها غرق

অর্থাৎঃ "আমার আহলে বাইত নূহের তরী সদৃশ্য । যে ব্যক্তি তাতে আরোহন করবে সে নাজাত পাবে আর যে ঐ তরী থেকে দূরে সরে থাকবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে ।[১৩]

উক্ত হাদীসটি এগারটি সূত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে আর সাতটি সূত্রে শীয়া গ্রন্থাবলীতে বর্ণনা করা হয়েছে ।

আহলে বাইত

নবী করিম (সা.)- এর আহলে বাইতকে ভালবাসার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই । তবে আহলে বাইত কারা– এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান । মুসলমানদের কোন এক সম্প্রদায় আহলে বাইত বলতে শুধুমাত্র তার সম্মানীতা স্ত্রীগণকে বুঝিয়ে থাকেন । আবার অন্য এক সম্প্রদায় এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হযরত ফাতিমা, তার স্বামী ও সন্তানদ্বয়কে রাসুলের সাথে সংযোগ করে থাকেন । আবার নবী (সা.) এর আহলে বাইতের মধ্যে হযরত আব্বাস, আক্বীল ও জাফর তাইয়্যারকেও শামিল করে থাকেন ।

প্রকৃতপক্ষে আহলে বাইতের সদস্যগণ কারা ? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে আমরা 'আহল' ও 'বাইত' শব্দদ্বয়ের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের উল্লেখ করে মূল অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করবো।

আরবী অভিধানে 'আহল' এর অর্থ হচ্ছেঃ

اهل الرجال، عشيرته و ذو قرباه، جمع : اهلون و اهلان، و اهل يأهل يأهل اهولا تأهل و اتهل: اتخذ اهلا.

অর্থাৎঃ- একটি পুরুষের পরিবার, তার আত্মীয়- স্বজন, 'আহল' এর বহুবচন হচ্ছে 'আহলুন' অতীত কাল বুঝানোর জন্য 'আহালা' এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্যে 'ইয়াহেলুন' বা 'ইয়াহালু' ব্যবহৃত হয়ে থাকে । আর 'আহুলান' হচ্ছে মূল ক্রিয়া সূচক শব্দ । 'তায়াহহালা' বা এত্তাহালার অর্থ হচ্ছে পরবিার গঠন করেন ।

و اهل الامر : ولايته وللبيت سكانه و للمذهب من يديه به، و للرجل زوجته كأهلته. للنبى (ص) ازواجه و بناته و صهره على (رضى الله عنه) او نسائه، و الرجال الذين هم و لكل نبى امنه.....

অর্থাৎঃ- কোন কাজের জন্যে আহল বলতে তার কতৃত্ব আর ঘরের জন্যে 'আহল' বলতে গৃহবাসীদের বুঝায় । মাযহাবের জন্য 'আহল'–এর অর্থ হচ্ছে মাযহাবের পরিচালক । একটা

পুরুষের ‘আহল’ বলতে তার স্ত্রীকে বুঝানো হয় । নবী (সা.) এর জন্যে ‘আহল’ বলতে বুঝায় তার স্ত্রীবর্গ কন্যাগণ, তার জামাতা আলী (রাজীঃ) এবং ঘরের মহিলারা অতঃপর নবীদের আহল হচ্ছে তাদের উম্মত.....।[১৪]

‘আহল’ শব্দটি পবিত্র আল কোরআনে ৫৪ বার ব্যবহার হয়েছে । প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এ শব্দটিকে । ‘আহল’ শব্দের অর্থ কখনো শুধুমাত্র স্ত্রী ও সন্তান উভয়কেই বুঝানো হয়েছে আল- কোরআনে । কোথাও আবার আহল বলতে আত্মীয়- স্বজনকেও বুঝানো হয়েছে ।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল- কোরআনে আল্লাহ বলেনঃ

(فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ)

অর্থাৎঃ- অতঃপর যখন মূসা (আঃ) তার প্রতিশ্রুত কর্মের সময়সীমা অতিক্রম করেন তখন তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে স্বদেশ পানে যাত্রা করেন । পথিমধ্যে তুর পর্বতের সন্নিকটে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি । সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসতে পারি অথবা তোমাদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করতে পারি ।[১৫]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ দু’বার ‘আহল’ শব্দ ব্যবহার করেছেন । এখানে ‘আহল’ শব্দের অর্থ স্ত্রী । উক্ত আয়াতে ‘আহল’ শব্দের উদ্দেশ্য হযরত মুসা (আ.) এর স্ত্রী অন্য কেউ নয় ।

আল- কোরআনে আল্লাহ বলেনঃ

(إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)

অর্থাৎঃ- "নিশ্চয় আমি তোমাকে (হযরত লুত আ.) এবং তোমার পরিবারকে নাজাত দিব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত, কেননা সে অভিশপ্ত এবং পশ্চাদপদের শিকার ।[১৬]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক 'আহল' বলতে স্ত্রী, পরিবার পরিজন, সন্তান- সন্ততি সকলকে বুঝিয়েছেন । যদিও লুতের স্ত্রীকে আল্লাহ অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন ।

আল্লাহ অন্যত্র হযরত লুত (আ.) সম্পর্কে বলেনঃ

(وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)

অর্থাৎঃ- "নূহ (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলো- হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফয়সালাকারী । (আল্লাহ) বলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে (তোমার পুত্র) তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চই সে অসৎ![১৭]

এক্ষেত্রে 'আহল' অর্থ ঐ ব্যক্তির পদাংক অনুসরণকারী পরিবারের সদস্য । এ কারণে আল্লাহ হযরত নুহ (আ.) এর পুত্রকে তার আহল এর মধ্যে গন্য করেননি । কেননা সে অসৎ কাজে লিপ্ত।

উপসংহারে বলা যায় 'আহল' শব্দের একক কোন অর্থ নেই । স্থান ভেদে এর অর্থ বিভিন্ন হতে পারে ।

আর 'বাইত' শব্দও কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে । 'বাইতের' অর্থও বিভিন্ন ধরণের । কোথাও 'বাইত' অর্থ মসজিদুল হারাম আবার কোথাও মসজিদুন্নাবী ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে ।

তবে আল- কোরআনের 'বাইত' শব্দ 'আহল' শব্দের সাথে সংযোগ করে ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার ।

সূরা হুদে আল্লাহ বলেন,

(رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ)

অর্থাৎঃ- আল্লাহর রহমত ও বরকত আহলে বাইতের উপর বর্ষিত ।[১৮]

সূরা আহযাবে আল্লাহ আরো বলেন,

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

অর্থাৎঃ- আল্লাহ মনস্থ করলেন তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখতে হে আহলে বাইত এবং মনস্থ করলেন তোমাদেরকে পুত- পবিত্র করতে ।[১৯]

মহানবী (সা.) এর হাদীসেও 'আহলে বাইত' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয়েছে । শিয়া- সুন্নি উভয় মাযহাবের বর্ণিত হাদীসগুলোতে প্রায় ৮০ পন্থায় 'আহলে বাইত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । তার পরও মুসলমানদের মধ্যে আহলে বাইতের সংজ্ঞা ও অর্থ এবং সদস্যদের ব্যাপারে যথেষ্ট মতপার্থক্য ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান । মুসলমানরা তাদের নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে আহলে বাইতের অর্থ করেই দায়িত্ব সমাপ্ত করে থাকেন । অনেকে বলে থাকেন, তাতহীরের আয়াতে উল্লেখিত আহলে বাইতের উদ্দেশ্য বনি হাশিমের লোকজন । আবার অনেকের মতে বনি হাশিমের মু'মিন সন্তানগণ অর্থাৎ আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান ব্যতীত অন্য কেউ আহলে বাইতের মধ্যে গন্য নয় ।[২০]

আবার কেউ কেউ বলেন, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ও তার সন্তানরা শুধুমাত্র আহলে বাইতের সদস্য ।[২১]

কোন এক মুসলিম সম্প্রদায় বলেন, রাসুলের (সা.) সম্মানিতা স্ত্রীগণ, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ইবনে আলী ও হযরত হুসাইন ইবনে আলী আহলে বাইতের সদস্যবৃন্দ ।[২২]

অনেকে বলেন, নবীর স্ত্রীরা শুধুমাত্র আহলে বাইতের মধ্যে গন্য । কেননা আকরামাহ বিন আব্দুল্লাহ নাজদাহ আল হারুরী- যিনি আলীর সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের অতিক্রম করেছে, সে 'নবীর (সা.) স্ত্রীগণ শুধুমাত্র আহলে বাইতের সদস্য বলে প্রচার করত । সে আরো বিশ্বাস করত খারেজী দল বহির্ভূত সকল মুসলমান কাফের । হজ্বের সময় সে চিৎকার করে বলত, 'যদি আমার হাতে শক্তি থাকতো তাহলে আমার ডানে বায়ে যত লোক আছে তাদের সকলকে হত্যা করতাম ।' সে মসজিদুল হারামে দাড়িয়ে উচ্চস্বরে ধ্বনি দিত, 'এখানে কাফের ব্যাতীত অন্য কেউ নেই ।' তার আক্বিদা- বিশ্বাসের মধ্যে আরেকটি দিক হলো যে সে বিশ্বাস করত,

انما انزل الله متسابه القرآن ليضل به

অর্থাৎঃ আল্লাহ কোরআনের 'মুতাশাবেহ' আয়াতগুলো মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অবতীর্ণ করেছেন ।

সে সমসাময়িক কালে মিথ্যাবাদী বলে খ্যাতি লাভ করেছিল । আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ও ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'আকরামার হাদীস জালকারী ও মিথ্যাবাদী বলে কুখ্যাতি আছে ।' ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল আনসারী তার সম্পর্কে বলেছেন, সে একজন মিথ্যাবাদী ।[২৩]

আকরামার ন্যায় আরো একজন ব্যক্তি নবীর (সা.) স্ত্রীগণকে শুধুমাত্র আহলে বাইতের মধ্যে শামিল করেছেন । তিনি হচ্ছেন মাক্বাতিল ইবনে সুলাইমান আল- বালখী আল আযুদী আল খোরাসানী । তিনি তৌহিদ ও রেসালাতের ব্যাপারে অনেক আপত্তিমূলক বক্তব্য পেশ করেছেন যা আহলে সুন্নাতের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি ।[২৪]

আকরামাহ ও মাক্বাতিল বিন সুলাইমান সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে উল্লেখিত আহলে বাইতের মধ্যে শুধুমাত্র নবীর (সা.) স্ত্রীগণকে গন্য করেছেন । যদিও আমরা উক্ত আয়াতের পূর্ববর্তী দু'টি আয়াতে নবীর স্ত্রীগণের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবধান বাণী পরিলক্ষিত করি

। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেননি যে তারা সমস্ত ধরণের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত । বরং তিনি আল কোরআনে উল্লেখ করেছেনঃ

(يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُ)

অর্থাৎঃ হে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা তো অন্যান্য নারীদের মত নও যদি আল্লাহকে ভয় কর ।[২৫]

যদি নবীর (সা.) স্ত্রীরা পবিত্র এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হতেন তাহলে আল্লাহ কখনো তাদের উল্লেখ করে এ ধরণের বক্তব্য পেশ করতেন না । সাথে সাথে নিম্নের আয়াতটিও যথার্থ বলে পরিগণিত হতো না ।

আল্লাহ বলেনঃ

(يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)

অর্থাৎঃ- হে, নবীর স্ত্রীগণ, তোমাদের মধ্যে যে প্রকাশ্য কোন অপবিত্র কাজে লিপ্ত হয় তার আযাব ও শাস্তি অন্যদের চেয়ে দ্বিগুন পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর জন্যে এ কাজ খুবই সহজ।[২৬]

আর যদি নবীর (সা.) স্ত্রীগণ সকল পাপ- পংকিলতা থেকে মুক্ত হবেন তাহলে নবীকে (সা.) কষ্ট দেয়া কি পবিত্রতার পরিপন্থি নয় ?

আল বুখারী তার স্বীয় সহিহাতে এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন,

انّ النبى هجر عايشة و حفصة شهرا كاملا و ذلک بسبب افشاء حفصة الحديث الذى اسراه لها الى عايشة، قالت للنبى: انّک اقسمت ان لا تدخل علينا شهرا ؟

অর্থাৎঃ- নবী (সা.) পূর্ণ এক মাস আয়েশা ও হাফসাকে বয়কট করেছিলেন । এটা এ কারণে যে হাফসা নবীর গোপন কথা আয়েশার কাছে ফাস করে দিয়েছিল । আয়েশা নবীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি নাকি প্রতিজ্ঞা করেছেন একমাস আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না ?[২৭]

সহি আল- বুখারীতে অন্যত্র এভাবে উল্লেখ আছে যে, ইবনে আব্বাস বলেছেনঃ

ابن عباس يقول: لم ازل حريصا على ان عمر بن خطاب عن المراتين من ازواج النبى (ص) التين قال الله تعالى فيها: ان تتوبا الى الله فقدصغت قلوبكما.

অর্থাৎঃ- আমি ওমর বিন খাত্তাবকে সে দু'জন নবীপত্নীর ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলাম, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেনঃ যদি তারা দু'জন আল্লাহর কাছে তওবা করে তাহলে সে কাজটিই সঠিক হবে । কেননা তোমাদের দু'জনের অন্তর (বাতিলের দকে) ঝুকে গিয়েছিল ।[২৮]

অতঃপর আল- বুখারী এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেনঃ

حتى حج و حججت معه.....حنى قال ابن عباس، فقلت للخليفه: من المراتين؟ فقال عمر بن خطاب:و اعجب لک يا ابن عباس ! هما عايشة و حفصة.....

অর্থাৎঃ- (ইবনে আব্বাস বলেন) ইতিমধ্যে তিনি (হযরত ওমর) হজ্জ সম্পন্ন করেন আর আমিও তার সাথে হজ্জ আদায় করি ।..... ইবনে আব্বাস বলেনঃ আমি খলিফাকে জিজ্ঞেস করলাম ঐ দু'জন মহিলা কারা ছিলেন ? ওমর বিন খাত্তাব উত্তর দিলেনঃ আশ্চর্য তো, তুমি তা জান না হে ইবনে আব্বাস ! তারা হলেন আয়েশা ও হাফসা..... [২৯]

বিখ্যাত সুন্নী আলেম ও তাফসীরকারক আল্লামা ফাখরে রাযী তার তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর আল-কাবির'- এ সূরা তাহরীমের চতুর্থ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াতটি হযরত আয়েশা ও হাফসাকে সম্বোধন করে নাযিল হয়েছে ।[৩০]

অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

ها هى عايشة تعقبها للنبى (ص) بعد ما فقدته فى ليالى نوبتها و قوله (ص) لها ما لک يا عايشة ! اغرت ؟ فقالت: و ما لى ان لا يغار مثلى على مثلک ؟ فقال لها افاخذک شيطانک ؟!

অর্থাৎঃ- যখন আয়েশা কয়েক রাত্র নবী (সা.) এর অনুপস্থিতি ও তার পালা অতিক্রম হওয়ায় চুপিসারে হযরতের পিছু লেগেছিল তখন মহানবী (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ তোমার কি হয়েছে হে আয়েশা ? তুমি কেন আমাকে শুধু তোমার জন্য মনে করছো ? আয়েশা বলেনঃ আমার মত মানুষ কি আপনার মত ব্যক্তির ব্যাপারে ইর্ষা করতে পারে না ? অতঃপর নবী (সা.) তাকে বললেনঃ তোমাকে কি তোমার শয়তানে ধরেছে ?[৩১]

এভাবে প্রিয় নবী (সা.) এর পিছু লাগা এবং মহানবীর (সা.) উক্তি 'তোমাকে কি তোমার শয়তান ধরেছে ?' কোনক্রমেই সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে উল্লিখিত 'আহলে বাইতকে আল্লাহ সমস্ত প্রকার অপবিত্রতা থেকে তুরে রেখেছেন এবং তাদেরকে পুত পবিত্র করেছেন; - উক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারে না ।

হযরত আয়েশা নবী করিম (সা.) এর অমীয় বাণী ও ঐতিহাসিক নির্দেশ অমান্য করে 'হাওয়াব' নামক স্থান অতিক্রম করে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন । ইতিহাসে এ যুদ্ধ "জঙ্গে জামাল" বা "উষ্টের যুদ্ধ" নামে অভিহিত । এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সাহাবী তাবেয়ীন ও হাফেজ- ক্বারী হতাহত হন । এ যুদ্ধের কারণ উদঘাটন করলেই বিবেকবান মানুষ মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন যে মা আয়েশা যদি কোরআনের পরিভাষায় 'রেজস' বা অপবিত্রতা থেকে মুক্ত থাকতেন তাহলে কখনো এ যুদ্ধ সংঘটিত হত না । এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে অবগত হবার জন্য পাঠকদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলো অধ্যায়নের অনুরোধ করছি ।

১. কামেল ফি আত তারিখ, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১০৭ ।

২. আল ফুতুহ, খণ্ড- ১, অধ্যায়- ২, পৃঃ- ৪৫৬ ও ৪৫৭ ।

৩. আনসাব আল আশরাফ, খণ্ড- ২, পৃঃ- ২২৮, কায়রো ।

৪. আত তাবাক্বাত আল কোবরা, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৩১, বৈরুত ।

৫. কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১৬১ ।

৬. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৯৭, রৈুত ।

৭. মাজমুআ আয- যাওয়ায়েদ, খণ্ড- ৭, পৃঃ- ৩৪ ।

৮. সহি আল বুখারী, কিতাব বিদয় আল খালক ।

৯. সহি আল বুখারী, কিতাব আল জিহাদ ওয়াল মিযার বাবে আয়ওয আন নাবী, খণ্ড- ৪, পৃঃ- ৪৬; খণ্ড- ২, পৃঃ- ১২৫ ।

১০. সহি মুসলিম, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৫৬০; খণ্ড- ৮, পৃঃ- ১৮১, মিশর, শেবকাত এলাহিয়া, শারহেন নাবাবী ।

তাছাড়াও হযরত আয়েশা হযরত ওসমানকে কাফের ফতোয়া দিয়ে জনগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন খলিফাকে হত্যা করতে । তার ঐতিহাসিদ ফতোয়া ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এভাবে উল্লেখ আছে যে তিনি বলেছেন,

اقتلو نعثلا فقد كفر

অর্থাৎঃ- না'সালকে হত্যা কর সে কাফের হয়ে গেছে ।

তিনি হযরত ওসমানকে না'সাল বলে একজন ইয়াহুদী বৃদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন ।

আবার কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে এভাবে বর্ণীত আছে যে, তিনি ওসমানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

اقتلو نعثلا فقد فجر

অর্থাৎঃ- না'সালকে হত্যা কর সে ফাজের হয়ে গেছে ।[৩২]

এত কিছুর পর কি করে তাতহীরের পবিত্র আয়াতটিতে উল্লেখিত আহলে বাইতের মধ্যে নবী (সা.) এর স্ত্রীগণও গণ্য হতে পারেন ?

বস্তুতঃ যদি আমারা তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থাবলী পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে, সেখানে আহলে বাইত বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ইবনে আলী ও হযরত হুসাইন ইবনে আলীকে বোঝানো হয়েছে । এ ধরণের হাদীসের সংখ্যা প্রচুর । তথাপি আমার সংক্ষিপ্ততার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিম্নে বহুল উল্লেখিত ও প্রচারিত কয়েকটি হাদীস সম্মানিত পাঠকবৃন্দের জন্য উপস্থাপন করলাম । নিরপেক্ষ মন ও মুক্ত চিন্তা নিয়ে বিবেচনা করার অনুরোধ রইল ।

একঃ নবী পত্নী উম্মে সালমা থেকে বর্ণীত আছে যে তিনি

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

আয়াতটির শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "এ আয়াতটি আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছে । তখন আমার গৃহে সাতজন লোক ছিলেন । তারা হলেনঃ জিবরাইল (আ.), মিকাইল (আ.), নবী (সা.), আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন । আর আমি ছিলাম দরজার মুখে । আরজ করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমি কি আহলে বাইতের মধ্যে গন্য নই ? উত্তরে তিনি বললেনঃ (না, এরকম নয়) নিশ্চয় তুমি মঙ্গল পথের যাত্রী, তুমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে গণ্য ।[৩৩]

দুইঃ আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবি তালিব থেকে বর্ণীত আছে যে তিনি বলেছেন,

كما نظر رسول الله (ص) الى رحمه هابطه، قال: ادعو لى، ادعو لى ! فقالت صفيحه- بنت حيى بن اخطب زوجه رسول الله (ص): من يا رسول الله ؟ قال (ص): اهل بيتى: عليا و فاطمة و الحسن و الحسين.

অর্থাৎঃ একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) জিবরাইল (আ.) এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন । তিনি বলেন, তাদেরকে আমার নিকট ডেকে আন, তাদেরকে আমার নিকট ডেকে পাঠাও ! সাফিয়্যা (নবী পত্নী, হুয়িয়্যা বিন আখতারের কন্যা) প্রশ্ন করলেনঃ কাদের কথা বলছেন হে আল্লাহর রাসুল ? প্রতিত্তোরে তিনি বললেনঃ তারা আমার আহলে বাইত- আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন ।[৩৪]

তিনঃ আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণীত হেয়েছে যে তিনি বলেছেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) ছয় মাস পর্যন্ত ফজর নামাজের সময় ফাতিমার গৃহের নিকট থেকে অতিক্রম করতেন এবং বলতেনঃ

الصلاة يا اهل البيت، (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

অর্থাৎঃ- হে আহলে বাইত, সালাম ও দরুদ তোমাদের উপর । নিশ্চয় আল্লাহ মনস্থ করেছেন তোমাদের কাছ থেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা দূরীভূত করতে হে আহলে বাইত এবং মনস্থ করেছেন তোমাদেরকে পুত- পবিত্র করতে ।[৩৫]

চারঃ মুসলিম তার সহিহাতে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেনঃ যখন অবতীর্ণ হল নিম্নলিখিত আয়াতটি

(فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)

অর্থাৎঃ বল (হে নবী)- এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের, মহিলাদের এবং নিজেদেরকে ডেকে আনি আর তোমারাও তাই কর । অতঃপর (এসো) চ্যালেঞ্জ করি আর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষন করি ।[৩৬]

তখন মহানবী (সা.) আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে ডেকে আনলেন । তিনি বললেনঃ

الهى هولاء اهلى

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ এরা আমার আহলে বাইত ।[৩৭]

পাঁচঃ সহি তিরমিযি গ্রন্থে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণীত আছেঃ

তাতহীরের আয়াত নাযিল হবার পর থেকে ছয় মাস পর্যন্ত প্রতিদিন যোহর নামাজের সময় আল্লাহর রাসুল ফাতিমার গৃহে আগমন করে উক্ত আয়াত পাঠ করতেন । প্রিয় নবী (সা.) উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় বলেছেনঃ

اللهم اهل بيتى و خاصتى فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ আমার আহলে বাইত থেকে তুমি সকল অপবিত্রতা দূরীভূত কর এবং পূত- পবিত্র কর ।[৩৮]

ছয়ঃ সহি মুসলিম ও জামেয় উসূল গ্রন্থদ্বয়ে এভাবে বর্ণীত আছে যে, হাসীন বিন সামারাহ যায়েদ বিন আরকামকে জিজ্ঞেস করলেন, নবীর পত্নীগণও কি আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য ? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ, না এরকম নয় । কেননা স্ত্রী জীবনের কিছু সময় স্বামীর সাথে অবস্থান করে । অতঃপর স্বামী তালাক দিয়ে দিলে সে তার পিতা- মাতা আত্মীয়- স্বজনের কাছে প্রত্যাবর্তন করে এবং স্বামী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যায় । কিন্তু রাসুলের আহলে বাইত এমন সব ব্যক্তিবর্গ যাদের জন্য সাদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তারা যেখানেই যান না কেন কখনো পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না ।[৩৯]

সাতঃ অন্যত্র এরূপ উল্লেখ আছে যে, তাতহীরের আয়াত পাঁচজন তথা নবী (সা.), হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত ফাতিমা, হযরত হাসান ইবনে আলী ও হযরত হুসাইন ইবনে আলীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে ।[৪০]

আটঃ বুখারী ও মুসলিম উভয়েই হযরত আয়েশার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মুসআব বিন শাইবাহ তার বোন সাফিয়্যা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেনঃ ‘একদা রাসুল (সা.) একটি কালো আ’বা পরিধান করে গৃহের বাইরে আসলেন । পথিমধ্যে হাসান ইবনে আলীর সাথে দেখা হল । তিনি হাসানকে স্বীয় আ’বার ভিতর প্রবেশ করালেন । অতঃপর হুসাইন ইবনে আলী আগমন করলে তাকেও পূর্বানুরূপভাবে তার আ’বার ভিতরে নিয়ে নিলেন । অতঃপর ফাতিমা ও আলী ইবনে আবি তালিব আগমন করলে তারাও নবীর আ’বার ভিতরে প্রবেশ করলেন । আর পরক্ষণে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেনঃ

(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)

অর্থাৎঃ- নিশ্চিয়ই আল্লাহ মনস্থ করলেন তোমাদের নিকট থেকে সমস্ত প্রকার অপবিত্রতা থেকে দূরীভূত করতে হে আহলে বাইত এবং মনস্থ করলেন তোমাদেরকে পুত- পবিত্র করতে ।[৪১]

আল্লাহ্ কর্তৃক হযরত আলীর মনোনয়ন

আহলে বাইতের শিরমনি, মা ফাতিমার প্রিয় স্বামী, বেহেশ্তের সর্দার ইমাম হাসান ও হুসাইনের সম্মানিত পিতা আলী হচ্ছেন মু'মিনদের নেতা বা অভিভাবক । এ প্রসঙ্গে আল কোরআন উল্লেখ করেছেঃ

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)

অর্থাৎঃ নিশ্চয় তোমাদের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ ও তার রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, নামায ক্বায়েম করেছে আর রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করেছে ।[৪২]

অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে উক্ত আয়াতটি ইমাম আলীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।[৪৩]

আবু ইসহাক বিন মুহাম্মদ আসসা'লিব তার স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে হযরত আবুযার গিফারী থেকে নিম্নলিখিত ভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করছেন । হযরত আবু যার গিফারী বলেছেন, আমি স্বীয় কর্নে শ্রবন করেছি যে রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

علی قائد البرره، و قاتل الکفره، منصور من نصره، مخذول من خذله

অর্থাৎঃ আলী সৎ লোকদের নেতা, কাফেরদের হত্যাকারী, যে তাকে সাহায্য করবে সে (আল্লাহ কর্তৃক) সাহায্য প্রাপ্ত হবে, যে তাকে ত্যাগ করবে (আল্লাহ) তাকে ত্যাগ করবেন ।[৪৪]

হযরত আবুযার গিফারী বলেন "আমি একদা রাসূল (সা.) এর সাথে যোহরের নামাজ আদায় করছিলাম । ইতিমধ্যে একজন ভিখারী মসজিদে প্রবেশ করে ভিক্ষা চাইলো ।

কিন্তু কেউ তাকে কোন সাহায্য করলো না । ভিক্ষুকটি দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালোঃ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো, আমি মসজিদে প্রবেশ করে সাহায্য চাইলাম কিন্তু কেউ কিছু দিল না । তখন হযরত আলী (আ.) নামাজে রুকু অবস্থায় ছিলেন । তিনি ইশারা করলে ঐ লোকটি আলীর হাতের আংটি খুলে নিয়ে যায় । আর এ ঘটনাটি নবীর চোখের সামনে ঘটে । নবীজি নামাজ শেষে দু হাত তুলে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলেনঃ

"হে আল্লাহ যখন হযরত মুসা (আ.) তোমাকে বলেছিল,

(وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي)

অর্থাৎঃ (হে আল্লাহ) তুমি আমার জন্যে আমার পরিবার থেকে আমার ভাই হারুনকে আমার পরামর্শদাতা নিয়োগ কর, তার মাধ্যমে আমার কোমরকে শক্তিশালী করে দাও এবং তাকে আমার কাজ কর্মে অংশিদার কর ।[৪৫]

তখন অহি নাযিল হয়েছিল । তুমি তার ভাই হারুনকে দিয়ে তার বাহুবল শক্তিশালী করেছিলে ।

اللهم انا مُحَمَّد بنيک و صفيک اللهم فاشرح لی صدری و يسرلی امری و اجعل لی وزيرا من اهلی عليا اخی و اشدد به ازری.

অর্থাৎঃ "হে প্রভু, নিশ্চয়ই আমি তোমার নবী এবং নির্বাচিত ব্যক্তি । হে আল্লাহ তুমি আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও । আমার জন্য আমার 'আহল' থেকে আলীকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ কর । তার মাধ্যমে আমার কোমরকে শক্তিশালী করে দাও ।"

তখনও প্রিয় নবী (সা.) এর মুনাজাত সমাপ্ত হয়নি এমনি সময় অবতীর্ণ হয় এ আয়াতঃ

(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)

অর্থাৎঃ নিশ্চয় তোমাদের নেতা ও অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ ও তার রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে, নামায ক্বায়েম করেছে আর রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করেছে ।[৪৬]

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, আল্লাহ ও তার রাসূলের নেতৃত্বের পাশাপাশি আলীর বেলায়েত বা অভিভাবকত্বের কথা আল কোরআন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছে । প্রিয় নবী (সা.) তার মুনাজাতে আলীকে তার সাহায্যকারী এবং তার হাত শক্তিশালী করার লক্ষে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে পরামর্শদাতা হিসেবে পাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন । আর তাই তার ইন্তেকালের পর আলীর অভিভাবকত্ব গ্রহন ইসলামকে শক্তিশালী করারই নামান্তর ।

নবী কর্তৃক হযরত আলীর মনোনয়ন

নবী পাক (সা.) এর নবুয়্যত লাভের তিন বৎসর পর নিম্ন আয়াতটি অবতির্ণ হয়ঃ

(وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

অর্থাৎঃ (হে নবী) তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে (দোযখের আযাবের প্রতি) ভয় প্রদর্শন কর ।[৪৭]

প্রায় সকল তাফসীরকারক ও ঐতিহাসিকদের মতে মহানবী (সা.) তখন বনি হাশেম গোত্রের ৪৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দুপুরের আহারের নিমন্ত্রণ দেন । আপ্যায়ন শেষে তিনি মেহমানদের মুখোমুখী দাড়িয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসার মধ্য দিয়ে তিনি তার বক্তব্য শুরু করেন । তিনি সুস্পষ্টভাবে তার রেসালাতের সুমহান বার্তা সকলের সামনে ব্যক্ত করেন ।

তিনি বলেনঃ

ان الرائد لا يكذب اهله و الله لا اله الا هو انى رسول الله اليكم خاصة و الى الناس عامة و الله لتموتن كما تنامون و لتبعثن كما تستيقظون و لتحاسبن بما تعملون و انها الجنه ابدا و النار ابدا

অর্থাৎঃ এটা অতি সত্যি কথা যে কোন এক জনগোষ্ঠির পথ প্রদর্শক তার লোকজনদের নিকট মিথ্যা বলতে পারেনা । আল্লাহর শপথ তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, আমি বিশেষভাবে তোমাদের জন্যে আর সাধারণভাবে সবার জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি । আল্লাহর শপথ তোমরা নিদ্রার ন্যায় মৃত্যুমুখে ঢলে পড়বে এবং জাগ্রত ব্যক্তিদের ন্যায় পুনরুত্থিত হবে একদিন । তোমরা তোমাদের কর্মের ফলাফল ভোগ

করবে সেদিন । নিশ্চয় জান্নাত চিরস্থায়ী আবাসস্থল (সৎ লোকদের জন্যে) আর জাহান্নামের অগ্নি হবে চিরস্থায়ী আবাস (অসৎ লোকদের জন্যে)।[৪৮]

অতঃপর তিনি বলেনঃ হে লোকসকল আমার মত উত্তম জিনিষ তোমাদের জন্যে অন্য কেউ আনেনি । আমি তোমাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল নিয়ে আগমন করেছি । আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদেরকে সেই মঙ্গল কাজের দিকে আহবান জানাতে ।

অবশেষে তিনি বলেনঃ

فايكم يوازرنى على هذا الامر على ان يكون اخى و وصى وخليفتى فيكم ؟

অর্থাৎঃ তোমাদের মধ্য থেকে আমার সাহায্যকারী হবার মত এমন কে আছো ? যার ফলে সে আমার ভ্রাতা, উত্তরাধীকারী ও খলিফা হিসাবে পরিগনিত হবে ?

যখন মহানবীর বক্তব্য এখানে এসে সমাপ্তি ঘটে তখন সমাবেশে নিঃশব্দ বিরাজ করছিলো । কেউ টু শব্দটুকু করেনি । ইত্যবসরে একজন যুবক হাত উচু করে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দ্ব্যার্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করলো "তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন শেরে খোদা হযরত আলী (আ.)। রাসূল (সা.) তাকে বসতে বললেন । আবারো তিনি পূর্ব প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করেন । কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেলনা । আলী ছাড়া কারো কাছ থেকে । পুনরায় তিনি আলীকে বসতে বললেন । এভাবে তিন বার তিনি পুনরাবৃত্তি করেন এবং প্রতিবার আলীই হাত উচু করে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ।

এ পর্যায়ে রাসূল (সা.) তার ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন । তিনি বলেনঃ

ان هذا اخى وصى و خليفتى عليكم فاسمعوا له اطيعوا

অর্থাৎঃ "নিশ্চয় এই যুবক (আলী) আমার ভাই, আমার উত্তরাধীকারী এবং তোমাদের মাঝে আমার খলিফা । তোমরা সকলে তার কথা শ্রবণ করো এবং তাকে অনুসরণ করো ।[৪৯]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে নবী (সা.) এর দাওয়াত তার নবুয়্যত লাভের তিন বৎসর পর সংঘটিত হয়েছির । তার দাওয়াতী মিশনের প্রথম ভাগেই এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় । তখনও তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৌহীদ ও নবুয়্যতের দাওয়াতই দিয়ে যাচ্ছিলেন । আল- কোরআনের ভাষায়ঃ

(قالوا لا اله الا الله تفلحون)

অর্থাৎঃ তোমরা বল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই তাতেই তোমরা সফলকাম হবে । এবং

ان محمدا رسول الله

মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ।

তবে এ ঐতিহাসিক দাওয়াতের ব্যবস্থাপনা, প্রিয় নবীর বক্তৃতা ও তৌহীদ- নবুয়্যতের ঘোষণার পাশাপাশি দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের খেলাফতের ঘোষণা থেকে এটাই উপলব্ধি করতে পারি যে, মহানবীর দাওয়াতের সূচনা পূর্বেই তিনি তার পরবর্তী খলিফা ও উত্তরাধীকারী নিযুক্তিতে ত্রুটি করেন নি । এটা এমন একটি বিষয় যা তৌহীদ ও নবুয়্যত থেকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । তৌহীদ ও নবুয়্যতের স্থায়িত্বের জন্যে ইমামতের ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সেদিন মহানবী (সা.) সবার সম্মুখে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন পরবর্তী নেতার মনোনয়নের বিষয়টি । এ দু'টি পদ তথা নবুয়্যত ও খেলাফত, মর্যাদার ক্ষেত্রে একটি বৃক্ষের দু'টি শাখার

ন্যায় । রেসালাত দ্বীন ইসলামের প্রবর্তক এবং ইমামত বা খেলাফত সেই প্রবর্তীত দ্বীনের সংরক্ষক । সকল হাদীসবেত্তা ও ঐতিহাসিক তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে নিম্নোক্ত ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ।

"মুহাম্মদ (সা.) তাবুকের যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে লোকজন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে তাকে সংঙ্গ দিয়েছিল । এ যুদ্ধে তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে মদীনার গভর্নর করে তার উপর দায়িত্বভার অর্পন করে যান । মদিনার আভ্যন্তরীন অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে তিনি এ ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন । কিন্তু আলী জেহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমি কি যুদ্ধে যেতে পারবো না ? নবী (সা.) উত্তরে বললেন, না । তৎক্ষণাৎ আলী ক্রন্দন শুরু করে দিলেন । তখন নবী (সা.) হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

انت منى بمنزلة هارون من موسى الا لا نبى بعدى

অর্থাৎঃ (হে আলী) তুমি আমার কাছে সে স্থানে অবস্থান করছো যে স্থানে হারুন মুসার কাছে ছিলো । তবে পার্থক্য হলো আমার পরে আর কোন নবী আগমন করবে না ।[৫০] মহানবী (সা.) এর উপরোক্ত উক্তি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নবুয়্যত ব্যতীত হযরত হারুনের সকল পদমর্যাদাই হযরত আলীর জন্যে সংরক্ষিত । আল-কোরআন উল্লেখ করছে, মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে বলেছিলেনঃ

اجعل لى وزيا من اهلى هارون اخى اشدد به ازرى و اشركه فى امرى

অর্থাৎঃ (হে আল্লাহ) তুমি আমার জন্যে আমার বংশ থেকে আমার ভাই হারুনকে আমার পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী হিসাবে নিয়োগ করো । তার মাধ্যমে আমার কোমর শক্তিশালী করে দাও এবং তাকে আমার কাজ কর্মে অংশীদার কর ।[৫১]

গাদীরে খুমের ঘটনা

হিজরী দশম বছর । রাসূল (সা.) বিদায় হজ্ব সম্পন্ন করেছেন । এ নশ্বর পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের জণ্যে প্রহর গুনছেন । প্রথম থেকে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এ বৎসর তিনি শেষ হজ্ব সমাপন করবেন । চতুর্দিক থেকে নবীর সাথে হজ্বে অংশগ্রহনের জন্যে অশংখ্য লোকের সমাগম হয়েছিলো । ঐতিহাসকিদের মধ্যে হাজীদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে । সর্বাপরী ৯০ হাজার থেকৈ ১২৪ হাজার মানুষের সমাগম ইতিহাসে উল্লেখ আছে । এ বৎসর তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন যা "বিদায় হজ্বের ভাষণ" নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে ।

হজ্ব সমাপ্ত করে তিনি আসহাবকে সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেছেন । প্রচন্ড গরম, মাটি ফেটে চৌচির । পথিমধ্যে 'গাদীরে খুম' নামক চৌরাস্তায় এসে তিনি থেমে গেলেন । এখানেই ঘটেছে সেই ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ গাদীরে খুমের ঘটনা । শীয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল এতিহাসিক ও হাদীস বিশারদ এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ।

নবী করিম (সা.) তার কয়েকজন ঘনিষ্ট সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন এ স্থানে সকলকে সমবেত করতে । যারা এখনো পিছে পড়ে আছে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে বললেন । যারা সিরিয়া ও ইরাক অভিমুখে এ চৌরাস্তা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন তাদেরকে এ স্থানে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন । উত্তপ্ত বালুকাময় পথঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল কিছুক্ষনের মধ্যেই ।

নবী (সা.)-এর জন্যে আসন প্রস্তুত করা হল । আসনের উপর সামিয়ানা টাংগানো হল । আসনটি এমন ভাবে উচু করে নির্মান করা হলো যেন বহুদূর থেকেও সকলে সুন্দরভাবে নবী করিম (সা.) কে দেখতে পায় ।

এমনকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জন্যে নবী (সা.) আসহাব ও হাজীদের কষ্ট দিবেন ? গাদীরে খুমে অবস্থান এবং ভাষণ দেয়ার জন্যে আসন তৈরী করার যে কারণ নিহিত আছে তাহলো অব্যবহিত পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া নিম্ন আয়াত

(يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)

অর্থাৎঃ "হে রাসূল আপনার রবের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌছিয়ে দিন । আর যদি এ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম না হন তা হলে রেসালাতের দাওয়াত-ই পৌছাতে পারলেন না । আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফের জনগোষ্ঠিকে হেদায়েত করবেন না ।[৫২]

উপরোল্লিখিত আয়াতটিতে রাসূল (সা.)কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন । নিশ্চয়ই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা শুধুমাত্র তিনি নবীকেই অবগত করিয়েছেন । আর তা এক্ষনে মানুষের সমক্ষে পেশ করতে হবে ? এমন কি আবতির্ণ করা হয়েছে যা এভাবে ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হবে ? সূরা মায়েদা হচ্ছে নবী (সা.) এর উপর অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা । এ সূরাটি নবীর শেষ জীবনে নাযিল হয়েছে । ইতিপূর্বে তৌহীদ, শেরক, রেসালাত, ক্বিয়ামত, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি সব ধরণের বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল । এমন কি বিষয় অবশিষ্ট রয়ে গেছে যা কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিতে হবে ? রাসূল (সা.) তো কোন ভীতু ব্যক্তি নন ।তিনি কঠোর বিপদেও মু'মিনদের সান্তনাকারী ছিলেন । তিনি সকল ধরণের বিপদ সংকুল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন অবশেষে তিনি মক্কা বিজয় করেছেন, বীর দর্পে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেছেন বিজয়ীর বেশে । কাবার মুর্তিগুলোকে তিনি ভেঙ্গে সেখানে নামাজ ক্বায়েম করেছেন ।

আল্লাহ তাকে এ আয়াতে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে দিচ্ছেন, যদি এ কাজটি আঞ্জাম দেয়া না হয় তাহলে রেসালাতের কোন কিছুই পৌছানো হলো না । এটা এমন একটা কাজ যার ফলে রেসালাত পরিপূর্ণ হবে । আর আল্লাহ রাসূলকে অভয় দিয়ে বলছেন "আল্লাহ তোমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।"

মুলতঃ একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার জন্যেই প্রিয় নবী (সা.) সবাইকে গাদীরে খুমে সমবেত হতে বলেছেন । মহানবী (সা.) তার আসন অলংকৃত করেছেন । তিনি ভাষণ দিচ্ছেনঃ

".....হে মানব মন্ডলী । আমি কি সকল মু'মিনদের চেয়ে সর্বোত্তম নেতা নই ? .... তোমরা কি জানোনা আমি প্রতিটি মু'মিনের প্রানের চেয়েও প্রিয় নেতা.....?" তখন সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, জ্বি ইয়া রাসূল আল্লাহ" ! .... অতঃপর তার পার্শ্বে উপবিষ্ট হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের হাত সকলের সম্মুখে উচু করে তুলে ধরলেন । ঐতিহাসিকগণ বলেন, নবী (সা.) হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের হাত এমনভাবে উচুতে তুলে ধরেছিলেন যে তাদের উভয়ের বাহুমুলদ্বয় সবাই দেখতে পেয়েছেন ।

অতঃপর মহানবী (সা.) বললেনঃ

"ايها الناس! الله مولای و انا مولاكم، فمن كنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله....."

অর্থাৎঃ "হে লোকসকল! আল্লাহ আমার প্রভূ ও নেতা, আর আমি তোমাদের নেতা বা মওলা ।সুতরাং আমি যার মওলা বা অভিভাবক আলীও তার মওলা বা অভিভাবক । হে আল্লাহ যে আলীকে ভালবাসে তুমিও তাকে ভালবাস, যে আলীর সাথে শত্রুতা

পোষণ করে তুমিও তাকে শত্রু গণ্য কর । আর যে তাকে সাহায্য করে তুমিও তাকে সহায়তা দান কর এবং যে তাকে ত্যাগ করে তুমিও তাকে পরিত্যাগ কর..... ।”
পরক্ষণই অবতীর্ণ হলো নিম্নোক্ত আয়াতটিঃ

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

অর্থাৎঃ “আজকে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলাম ।[৫৩]
সাথে সাথে রাসূল (সা.) বলেনঃ

الله اكبر على اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرب بر سالتى و الولايه لعلى

অর্থাৎঃ “আল্লাহু আকবার, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং নেয়ামত সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । আমার রব আমার রেসালাত ও আলীর বেলায়াতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন ।”
অতঃপর সকলে পর্যায়ক্রমে আলীকে অভিন্দন জ্ঞাপন করতে লাগলেন । ইত্যবসরে হযরত ওমর বলে উঠেলেন,

هنيئا لک يا ابن ابى طالب اصبحت و امسيت مولى كل مؤمن و مؤمنه.

অর্থাৎঃ “শুভ হোক আপনার জন্যে হে আলী বিন আবি তালিব । আজ থেকে আপনি সকল মুমিন নর নারীদের মওলা হিসেবে পরিগণিত হলেন ।”
অন্য রেওয়ায়েত এরূপ আছে যে, হযরত ওমর বলেছেন,

بخ بخ لک یا ابن ابی طالب

অর্থাৎঃ মারহাবা, , মারহাবা হে আবু তালিবের পুত্র ।

গাদীরে খুমের এ ঐতিহাসিক ঘটনাটি ১১০ জন সাহাবী, ১০জন সর্বজন শ্রদ্ধেয় তাবেয়ী এবং ৩৬০ জন বিশিষ্ট ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন । এ ঘটনাটির বর্ণনা সর্বস্তরের ইতিহাসবেত্তাগণ তাদের স্ব-স্ব পুস্তকে সহি হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন । ইয়াকুবী এটাকে সুস্পষ্ট সহি হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেন । পাঠকের গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি মাত্র ।[৫৪]

হযরত আবু বকরের খেলাফত লাভ

কথিত যে, নবী করিম (সা.) হযরত আবুকবরকে খেলাফত দিয়ে গেছেন । তিনি হযরত আবুবকরকে নামাজের ইমামতি করার দায়িত্ব দিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে হযরত আবু বকরই খেলাফতের আসন অলংকৃত করার জন্যে অন্য সবার চাইতে বেশী যোগ্য । আর তাই বনি সাক্বিফার সমাবেশে সাহাবীরা তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন ।"

কিন্তু ইতিহাস স্বীকৃত সত্য যে, বনি সাক্বিফাতে খলিফা নির্বাচনের প্রসংঙ্গ নিয়ে মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে যে বাক-বিতন্ডা ও তর্ক বিতর্ক হয়েছিলো সেখানে কখনো নামাজের প্রসংঙ্গ উত্থাপিত হয়নি । উপস্থিত কেউ হযরত আবু বকরের খেলাফত লাভের জন্যে নামাজের ইমামতির যুক্তি উপস্থাপন করেন নি । সেখানে আমরা দেখতে পাই আনসাররা খেলাফতের জন্যে নিজেদেরকে সর্বাধিক যোগ্য হিসেবে তুলে ধরেছিলেন । আর মোহাজেররা খেলাফতের জন্যে নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছিলন । তারা সেখানে কোন ক্রমেই আবুবকরের নামাজের ইমামতের ঘটনা তুলে ধরেননি । বরং হযরত ওমর সেখানে এগিয়ে এসে ঝগড়া ও মতভেদ এড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "আমি আবু বকরের হাতে বাইয়াত গ্রহন করলাম।" এভাবে সেদিন বনি সক্বিফাতে উপস্থিত সাহাবীরা হযরত আবুবকরের হাতে বাইয়াত গ্রহন করেছিলেন ।

তখনও রাসূলের পবিত্র লাশ দাফন করা হয়নি খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে অনৈক্য শুরু হয়ে গিয়েছিল । বনি সক্বিফার সমাবেশে সাহাবীদের মাঝে উত্তপ্ত মতদ্বন্ধ কি প্রমাণ করে না যে তাদের মধ্যে খেলাফতের ব্যাপারে কোন প্রকার ঐক্যমত ছিল না ?[৫৫]

মুলতঃ বনি সক্বিফার নির্বাচনী সমাবেশেরই বা কি প্রয়োজন ছিল ? নবী (সা.) তো হযরত আবু বকরকে খলিফা মনোনীত করে গেছেন-ই ! আর যদি তিনি নবী (সা.)

কর্তৃক খলিফা মনোনীত হয়েই থকবেন তাহলে সেখানে সেদিন কারো মনে ছিলো না কেন ?

হযরত আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরকে জিজ্ঞেস করেন, "খেলাফতের ব্যাপারে নবী (সা.) আপনাকে কি কিছু বলে গেছেন ? তারা উভয়েই বললেন না । অতঃপর তিনি হযরত আলীকে বলেন, " হে আলী তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমি তোমার হাতে বাইয়াত গ্রহন করি ।"[৫৬]

বস্তুতঃপক্ষে নবী (সা.) কর্তৃক খেলাফতের মনোনয়ন হযরত আলী ইবনে আবি তালিবকেই প্রদান করা হয়েছিল যা গাদীরে খুমের ঘটনায় আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি ।

আর নামাজে ইমামতির বিষয়টা কি করে খেলাফতের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে ? সাহাবী ও তাবেয়ীনের যুগে কখনো এ ধরণের ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয়নি । তাবেয় ও তাবেয়ীনের যুগে যখন হযরত আবু বকরের খেলাফতের বৈধতার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয় উত্থাপিত হতে থাকে তখন তার নির্বাচনের বৈধতা প্রমাণের জন্যে নামাজে ইমামতির যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে । আর হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হযরত আবু বকরের নামাজে ইমামতির হাদীস ছাড়াও হযরত হাফসা থেকে বর্ণিত হাদীসও বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । তিনি বলেছেন, "আবু বকর নামাজে ইমামতি করেন নি, বরং ওমর নামাজে ইমামতি করেছেন ।"[৫৭]

অন্যদিকে এমন সব হাদীস বিদ্যমান যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, অসুস্থ অবস্থায়ও প্রিয় নবী (সা.) স্বয়ং নামাজে ইমামতি করেছেন ।[৫৮]

সুতরাং নামাজে ইমামতির বিষয়টা কোনক্রমে খেলাফত লাভের বৈধ কারণ হতে পারে না ।

আর যদি হযরত আবু বকর রাসূলের খলিফা হিসেবে মনোনীত হয়ে থাকবেন তাহলে এত সাহাবীদের বিরোধীতার কারণ কি ?

হযরত আবু বকরের খেলাফতের প্রতি মা ফাতিমার অস্বীকৃতি

হযরত ফাতিমা সালামুল্লাহ আলাইহি তার দুনিয়া ত্যাগের পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত হযরত আবু বকরকে খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন নি ।[৫৯]

তিনি কি জানতেন না যে নবীজি বলেছেনঃ

مَنْ ماتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مَيْتَةً جاهِلِيَّةً

অর্থাৎঃ "যে ব্যাক্তি তার যামানার ইমামকে না চিনে মৃত্যু বরণ করলো সে জাহেলিয়াতের সাথে মৃত্যু বরণ করল।[৬০]

নিশ্চয়ই নবী করিম (সা.) এর প্রিয় কন্যা হযরত আবু বকরের খেলাফতের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদানের কারণে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করতে পারেন না । কেননা প্রিয়নবী (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেনঃ

فاطمه سيدة نساء العالمين

অর্থাৎঃ "ফাতিমা বিশ্ব নারীদের নেত্রী।"

তিনি আরো বলেছেনঃ

فاطمه سيدة نساء اهل الجنّة

অর্থাৎঃ "ফাতিমা বেহেশতের নারীদের নেত্রী।"[৬১]

তিনি কখনো এমন কাজ করতে পারেন না যাতে তিনি জাহেলী মৃত্যু বরণ করতে পারেন । তাহলে তো নবীজীর কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায় । হযরত ফাতিমার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "ফাতিমা আমার দেহের অংশ, যে ফাতিমাকে কষ্ট দেয় সে আমাকে কষ্ট দেয় ।"[৬২]

যদি হযরত ফাতিমার (সা.আ.) বেহেশতে যাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে থাকে তাহলে কি হযরত আবু বকরের খেলাফতের অস্বীকার করেও বেহেশতে যাওয়া যায় ? হযরত আবু বকর

যদি সত্যিই ইমাম বা খলিফা হয়ে থাকেন তাহলে তো হযরত ফাতিমার (সা.আ.) জন্য ফরজ ছিল ইমামের আনুগত্য করা । আর ফাতিমার (সা.আ.) বিরোধীতাই প্রমাণ করছে যে, তিনি হযরত আবু বকরকে বৈধ খলিফা হিসেবে মান্য করতেন না । তিনি নিশ্চয় তার যমানার ইমামকে চিনে মৃত্যু বরণ করেছেন । আর এভাবেই তিনি বেহেশতের নারীদের নেত্রী হিসেবে গন্য হবেন । তিনি তো কোন ভুল- ত্রুটি করতে পারেন না । আর খেলাফতের অস্বীকার করার মত ভুল ! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে তিনি আহলে বাইতকে সব ধরণের অপবিত্রতা বা পাপ –পংকিলতা থেকে মুক্ত রেখেছেন । অতএব এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে নবী (সা.) এর ইহলোক ত্যাগের পর তিনি আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে ইমাম হিসেবে মানতেন । তিনি মসজিদে নববীতে ফাদাক বাগান কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে আর হযরত আলীর ন্যায্য খেলাফতের স্বপক্ষে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য রেখেছেন তা থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে তিনি হযরত আলীকেই তার ইমাম বা নেতা হিসেবে মান্য করতেন ।[৬৩]

হযরত ফাতিমার ব্যাপারে মহানবী (সা.) আরো বলেছেনঃ

فاطمة مهجة (بهجة) قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمّة من ولدها أمناء ربي وحبل المدود بينه و بين خلقه، من اعتصم بهم نجا ، ومن تخلف عنه هوى.

অর্থাৎঃ- “ফাতিমা আমার হৃদয়ের উল্লাস, তার দু’ ছেলে আমার অন্তরের ফসল এবং তার স্বামী আমার নয়নের জ্যোতি আর তার সন্তানদের মধ্যে থেকে ইমামরা হচ্ছেন আমার রবের আমানত রক্ষাকারী । তারা সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিকুলের মাঝে (সমন্বয় সাধনকারী) দীর্ঘ রশ্মি । যে তাদের শক্ত করে আকড়ে ধরলো সে নাযাত পেল আর যে তাদের কাছ থেকে দুরে সরে থাকলো সে ধ্বংস হলো ।”[৬৪]

উক্ত হাদীসে নবী করিম (সা.) হযরত ফাতিমা ও তার স্বামী- সন্তানদের গুরুত্ব এবং তাদের অনুসরনের ব্যাপারে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন । হযরত ফাতিমাকে হৃদয়ের উল্লাস বলার কারণ কোন মতেই শুধুমাত্র সন্তান হওয়ার কারণে নয় বরং তিনি ফাতিমার ভিতর এমন সব মহৎ গুনাবলীর সমাবেশ দেখতে পেয়েছিলেন যার কারণে এতসব বিশেষণ উল্লেখ করেছেন । তার স্বামী ও সন্তানদের অনুসরণ নাজাত ও মুক্তি বয়ে আনবে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন । সুতরাং এটা বুঝতে আর বাকী থাকার কথা নয় যে নেতৃত্ব ও নাজাতের প্রশ্নে হযরত ফাতিমাও তার স্বামীকে অনুসরন করতেন তার সম্মানিত পিতার ইন্তেকালের পর । কেননা তাতেই রয়েছে নাজাত ও মুক্তি ।

হাদীস শরীফে বার ইমাম

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, আল-কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'ক্বিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেককে তার ইমামের সাথে পুনরুত্থিত করা হবে ।' আর এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে রাসূল (সা.) এর পরলোকগমনের পর মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন পথ ও মতের উদ্ভব হয়েছে । আর ন্যায় সঙ্গত কারণেই প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে তার অনুসৃত নেতৃত্বের সাথে ক্বিয়ামতের দিবসে পুনরুত্থিত করা হবে । সে কারণে ইসলাম ও ইসলামী উম্মতকে সঠিক খাতে প্রবাহিত এবং সকল প্রকার বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত রাখার জন্যে ইমামদের গুরুত্ব অতুলনীয় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন,

لا يزال الاسلام عزيزا الى اثنى عشر خليفة

অর্থাৎঃ ইসলাম প্রিয়পাত্র হবেনা যতক্ষন না পর্যন্ত বারজন খলিফা অতিবাহিত হবে ।[৬৫] মহানবী (সা.) এর অন্তর্ধানের পর ইসলামে বারজন খলিফা বা নেতা আগমন করবেন, এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে দু'ধরণের হাদীস পরিলক্ষিত হয়। **একঃ** এমন সব হাদীস যেখানে শুধূমাত্র বারজন খলিফার আগমন বার্তা দেয়া হয়েছে যে তারা সকলে কোরাইশ বংশ থেকে হবেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ

روى البخارى عن جابر بن سمره قال: سمعت رسول الله يقول: «يكون اثناعشر اميرا» فقال كلمه لم اسمعها، فقال ابى: انه قال: «كلهم من قريش»

অর্থাৎঃ আল বুখারী জাবির বিন সামারাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন আমি আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনেছি যে তিনি বলেছেনঃ বারজন নেতা (আমার

পরে) আগমন করবে । অতঃপর একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, আমি শুনতে পাইনি । আমার পিতা বলেন, তিনি বলেছেন তারা সকলে কুরাইশ বংশ থেকে হবেন ।[৬৬]

মুসলিম তার সহীহাতে জাবির বিন সামারাহ থেকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন, জাবির বিন সামারাহ বলেনঃ

دخلت مع ابى على النبى (ص) فسمعته يقول: ان هذا الامر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنى عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفى على، قال فقلت لابى: ما قال ؟ قال : «كلهم من قريش»

অর্থাৎঃ "আমি আমার পিতার সাথে নবী (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলাম । অতঃপর আমি শুনতে পেলাম যে তিনি বলেছেনঃ যতক্ষন পর্যন্ত বরাজন খলিফা আগমন না করেছেন ততক্ষন পর্যন্ত মুসলমানদের ক্রিয়া কর্ম সুস্পষ্টভাবে সম্পন্ন হবে না । তিনি (জাবির) বলেনঃ নবী (সা.) কি যে বললেন আমি তা বুঝতে পারি নি । তিনি বলেন, আমি আমার বাবাকে বললাম, তিনি কি বলেছিলেন ? উত্তরে আমার পিতা বলেন, তিনি বলেছেনঃ তারা সবাই কুরাইশ বংশ থেকে হবেন ।"[৬৭]

মুসলিম অন্যত্র আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন । তিনি উল্লেখ করেন যে নবী (সা.) বলেছেনঃ

لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا ثم تكلم النبى (ص) يكلمه خفيت على فسألت ابى: ماذا قال رسول الله (ص) ؟ فقال «كلهم من قريش»

অর্থাৎঃ যতক্ষন পর্যন্ত বারজন খলিফা মানুষের উপর কর্তৃত্ব না করছেন ততক্ষন পর্যন্ত তাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে না । অতঃপর নবী (সা.) কি যেন উচ্চারণ করলেন আমি তা বুঝতে পারিনি । আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম নবী

(সা.) কি বলেছেন ? তিনি বলেন নবী (সা.) বলেছেন, তারা সকলে কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ।

আবু দাউদ জাবির বিন সামারাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেনঃ

سمعت رسول الله (ص) يقول: لا يزال هذا الدين عزيزا الى اثنى عشر فكبر الناس و ضجوا، ثم قال لابى: يا اباه ما قال ؟ قال: «كلهم من قريش»

অর্থাৎঃ আমি রাসূলুল্লাহর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, বারজন পর্যন্ত এ দ্বীন পৃথিবীর বুকে সম্মানিত থাকবে । অতঃপর জনগনের তাকবীর ধ্বনীতে কোলাহল সৃষ্টি হল । পরে তিনি কি যেন একটা শব্দ বললেন । আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা তিনি কি বলছেন ? পিতা বললেন তিনি বলেছেন, তারা সকলে কুরাইশ বংশ থেকে আসবেন ।[৬৮]

তিরমিযি তার সহীহাতে এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

قال جابر بن سمره انه قال رسول الله: يكون من بعدى اثنى عشر اميرا ثم تكلم بشلى لم افهمه فسألت الذى يلينى، فقال: قال كلهم من قريش.

অর্থাৎঃ জাবির বিন সামারাহ বলেছেন যে রাসূল (সা.) বলেছেনঃ আমার পরবর্তী বারজন আমীর আগমন করবেন । অতঃপর তিনি কিছু বললেন যা আমার বোধগম্য হয়নি । আমি আমার পেছেনে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি কি বলেছেন ? তিনি বললেন রাসূল (সা.) বলেছেনঃ তারা সবাই কুরাইশ বংশদ্ভুত হবেন ।[৬৯]

জনাব তিরমিযি উক্ত হাদীসটিকে সহি ও হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন । তিনি একই রকম আরো অনেক হাদীস জাবির বিন সামারাহ থেকৈ বর্ণনা করেছেন ।

বারজন খলিফা সংক্রান্ত বিষয়ে মুসনাদে আহামাদের গ্রন্থকার, জাবির বিন সামারাহ থেকে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করেছেনঃ

قال سمعت النبى يقول : يكون لهذه الامه اثنى عشر خليفة

অর্থাৎঃ তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা.) - এর কাছ থেকে শুনেছি যে তিনি বলেছেনঃ আমার উম্মতের জন্যে বারজন খলিফা আগমন করবেন । লেখক মোট ৩৪ টি সূত্রে একই ধরণের হাদীস তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন ।[৭০]

আল হাকেম নিশাপুরী তার বিখ্যাত 'আল মুসতাদরাক আস- সহিহাইন ফি'মারিফাত আস- সাহাবা' - তে আউন বিন জাহফিা থেকে উপরোক্ত হাদীসসূহের ন্যায় আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এগুলো তার পিতার কাছ থেকে শুনেছেন ।[৭১]

তাছাড়াও আরো বহু ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থে এ ধরণের হাদীস বর্ণিত আছে ।[৭২]

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে সুন্নী বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতি তার সুপরিচিত গ্রন্থ "তারিখ আল খোলাফা" তে নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করেছেনঃ

و عند احمد و البزار بسند حسن عن ابن مسعود انه سئل كم يملک هذه الامه من خليفه ؟ فقال: سألنا عنها رسول الله (ص) فقال : اثنا عشر كعده نقباء بنى اسرائيل.

অর্থাৎঃ আহমাদ ও আল বাযযার উত্তম সনদের ভিত্তিতে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করছেন যে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কতজন খলিফা এ উম্মতের উপর শাসন চালাবনে ? তিনি বললেন, আমারা এ প্রসংঙ্গে নবী (সা.) কে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি বলেছেন, তার বনি ইসরাইলের বারজন নকীবের সমান সংখ্যক হবেন ।[৭৩]

ইবনে হাজার তার স্বীয় গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেনঃ

اخرج الطبرانى عن جابر بن سمره ان النبى (ص) قال: يكون بعدى اثنى عشر اميرا كلهم من قريش.

অর্থাৎঃ তাবারানী জাবির বিন সামুরাহ থেকে বর্ণনা দিচ্ছেন যে নবী (সা.) বলেছেনঃ আমার পরে বারজন নেতা আগমন করবে, তারা সকলে কুরাইশ বংশের হবেন ।[৭৪]

আমরা এই প্রথম প্রকার হাদীসসমূহ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মুসলিম উম্মতের কাজ-কর্ম সুস্পষ্টভাবে পরিচালনার জন্যে, ইসলামকে সম্মানের আসনে অধিষ্ট করার লক্ষে নবী (সা.)-এর বংশ কুরাইশ থেকে তার অন্তর্ধানের পর পর্যায়ক্রমে ইমাম বা খলিফা হিসেবে বারজন সুমহান ব্যক্তি আগমন করবেন ।

দুইঃ এমন সব হাদীস যেখানে স্পষ্ট করে বার ইমামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । অনেক সুন্নী গ্রন্থকার তাদের প্রত্যেকের নাম তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহে উল্লেখ করেছেন । তারা বলেছেনঃ বার ইমামের প্রথম হচ্ছেন আলী ইবনে আবি তালিব । অতঃপর তার জৈষ্ঠ পুত্র হাসান, তার পর হুসাইন (আ.)। অতঃপর হুসাইনের বংশ থেকে নয়জন ইমাম আসবেন যার শেষজন হবেন মাহদী মওউদ ।

ইয়া নাবিউল মাওয়াদ্দা গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত আছেঃ

আতাল নামক একজন ইয়াহুদী মহানবী (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ পেশ করলোঃ হে মুহাম্মদ, কয়েকটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই, যা কিছুদিন থেকৈ আমার মানসপটে আন্দোলিত হচ্ছে । যদি আপনি এর উত্তর আমাকে প্রদান করেন তাহলে আমি আপনার হস্তে ইসলাম গ্রহন করবো ।

নবী পাক (সা.) বললেন, হে 'আবু আম্মারা', তুমি প্রশ্ন করে যাও, কোন অসুবিধা নেই । ঐ ব্যক্তি কয়েকটি প্রশ্ন করলো এবং প্রতিবারেই আপনি সত্য বলেছেন, বলে সম্মতি প্রকাশ করলো । লোকটি জিজ্ঞেস করলোঃ আমাকে বলে দিন, আপনার

উত্তরাধীকারী কে ? কেননা কোন নবীই উত্তরাধীকারী না রেখে দুনিয়া ত্যাগ করেন নি । আমাদের নবী হযরত মূসা (আ.) বলে গেছেন তার অবর্তমানে হযরত ইউশায়'বিন নুন হলেন আল্লাহর নবী । নবী করিম (সা.) উয়াহুদী লোকটির প্রশ্নের উত্তরে বললেনঃ

আমার উত্তরাধীকারী হলো আলী ইবনে আবি তালিব এবং তার পরে আমার দুই সন্তান হাসান ও হুসাইন । অতঃপর অবশিষ্ট নয়জন ইমাম, হুসাইনের বংশ থেকে আগমন করবেন ।

"হে মুহাম্মদ দয়া করে তাদের নাম বলে দিন"- লোকটি বললো । নবী (সা.) বললেনঃ হুসাইনের পরলোকগমনের পর তার পুত্র আলী, তার অন্তর্ধানের পর স্বীয় পুত্র মুহাম্মদ, তার ইন্তেকালের পর জা'ফর আর জাফরের তিরোধনের পর তদীয় পুত্র মুসা, মুসার ইহলোক ত্যাগের পর তার ছেলে আলী, আলীর ইন্তেকালের পর ততদীয় পুত্র মুহাম্মদ আর মুহাম্মদের পর তদীয় পুত্র আলী, আলীর ইন্তেকালের পর তদীয় ছেলে হাসান এবং হাসানের পর তদতীয় সন্তান মুহাম্মদ মাহদী পর্যায়ক্রমে ইমাম হবেন । তারা আল্লাহর হুজ্জাত বা যমিনের বুকে অকাট্য দলীল ।"

পরক্ষনেই ইয়াহুদী লোকটি ইসলাম গ্রহন করলেন । তিনি সঠিক পথনির্দেশনা পেয়ে আল্লাহর অশেষ প্রশংসা করে বিদায় নিলেন ।[৭৫]

এ ধরণের প্রচুর হাদীস ইমামীয়া মতাবলম্বীদের গ্রন্থাদিতে পরিলক্ষিত হয় । যেহেতু আমরা তাদের কোন বর্ণনা এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করতে অনিচ্ছুক তাই প্রথম থেকেই চেষ্টা করে আসছি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নির্মল ও পরিশুদ্ধ উৎসসূহ থেকেই সকল হাদীস বর্ণনা করতো ।

আরো একটা হাদীসে জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেনঃ যখন

(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

অর্থাৎঃ তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ কর, অনুসরণ ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে 'উলুল আমর'- এর ।

আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন আমি রাসূরে খোদা (সা.) কে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আল্লাহ ও তার রাসূলকে চিনেছি । এখন উক্ত আয়াত অনুযায়ী 'উলুল আমর' কে চেনা আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন যাদেরকে অনুসরণ করা, যাদের আনুগত্য করা আমাদের জন্যে ফরজ করা হয়েছে । অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের জন্যে উলুল আমরের উদ্দেশ্য বলে দিন ।

রাসূলে আকরাম (সা.) উত্তরে বললেনঃ হে জাবির, তারা আমার উত্তরাধীকারী এবং আমার পরবর্তীকালের ইমাম । তাদের প্রথম জন আলী ইবনে আবি তালিব । অতঃপর পর্যায়ক্রমে হাসান, হুসাইন, আলী ইবনে হুসাইন এবং মুহাম্মদ ইবনে আলী । তৌরাতে এই শেষোক্ত ইমামের নাম বাক্কির হিসেবে প্রসিদ্ধ । তুমি বৃদ্ধ বয়সে মুহাম্মদ বিন আলীর সাক্ষাত লাভ করবে তাকে আমার সালাম পৌছিয়ে দিও ।

অতঃপর তদীয় পুত্র জাফর, জাফরের ছেলে মুসা, তার পুত্র আলী, আলীর পুত্র মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পুত্র আলী এবং তদীয় পুত্র হাসান অতঃপর হাসানের পুত্রের আসল নাম ও ডাক নাম আর আমার আসল নাম ও ডাক নাম একই হবে । আল্লাহ তাকে সমগ্র বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন । তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করবেন । তার অদৃশ্যতার সময়সীমা দীর্ঘ হবে । যাদের ঈমান শক্তিশালী তারাই শুধু তার নেতৃত্বের উপর অটল থাকবেন ।[৭৬]

অন্যত্র এভাবে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেনঃ আমি নবীদের সর্দার আর আলী বিন আবি তালিব হচ্ছেন উত্তরাধীকারীদের নেতা । নিশ্চয়ই আমার পরে বারজন উত্তরাধীকারী হবেন । তাদের সর্ব প্রধান ও সর্ব প্রথম হচ্ছেন আলী ইবনে আবি তালিব । তারপর হাসান, হাসানের পর তারই সহোদর ভ্রাতা হুসাইন এবং হুসাইনের পর পর্যায়ক্রমে আলী বিন হুসাইন, মুহাম্মদ বিন আলী, জা'ফর বনি মুহাম্মদ, মুসা

বিন জা'ফর, আলী ইবনে মুসা, মুহাম্মদ বিন আলী, আলী ইবনে মুহাম্মদ, হাসান ইবনে আলী এবং সর্বশেষ ইমাম হচ্ছেন আল মাহদী ।[৭৭]

মুসলিম তার সহীহাতে নিম্নলিখিতভাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেনঃ

قال رسول الله (ص): لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة او يكون عليكم اثنى عشر خليفة، اولهم على بن ابى طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين.....آخرهم المهدى.

অর্থাৎঃ আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেনঃ দ্বীন ইসলাম ধ্বংস হবে না কিয়ামত পর্যন্ত, অথবা বারজন খলিফার আগমন পর্যন্ত, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইমাম হচ্ছেন আলী ইবনে আবি তালিব, অতঃপর হাসান, তারপর হুসাইন, তারপর আলী ইবনে হুসাইন..... তাদের সর্বশেষ হচ্ছেন আল মাহদী ।

জনাব বুখারীও তার সহীহাতে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন । 'ইয়া নাবিউল মাওয়াদদ্দা' গ্রন্থে উক্ত হাদীসটির মধ্যে অতিরিক্ত আরো কয়েকটি কথা সংযুক্ত করা হয়েছে । গ্রন্থকার آخرهم المهدى অর্থাৎ সর্ব শেষ আল মাহদী কথাটি বর্ণনা করার পর লিখেছেনঃ

هم ائمة مطهرون معصومون و خلفائى من بعدى

অর্থাৎঃ { নবী (সা.) বলেছেন} তারা হচ্ছেন পবিত্র মা'সুম ইমাম এবং আমার পরবর্তীতে আমার খলিফা ।[৭৮]

ইসলামী মাযহাব ও তার বৈশিষ্ট্য

ইত্যপূর্বেকার আলোচনা থেকে এটা দিব্যলোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী (সা.) কর্তৃক মনোনীত খলিফা ব্যতীত মানুষের নির্বাচিত খলিফাদের অনুসরণ কোনক্রমেই সুন্নতের অনুসরণ বলে গন্য হতে পারে না ।

অতএব নবী (সা.) এর সুন্নতের অনুসারী সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবেয় তাবেয়ীন এবং তাদের পরবর্তীকালের জনগন আহলে বাইতের অনুসারী ছিলেন । আর বর্তমান যুগের ইমাম, আহলে বাইতের বার ইমামের সর্বশেষ মহাপুরুষ । বার ইমামের অনুসারী হওয়ার জন্য নবী (সা.) এরই তাগিদ রয়েছে । তাদের কর্মপন্থা, রীতিনীতি ও জীবন –চরিত সকল কিছুই ছিল নবী (সা.) এর সুন্নাতের-ই চরম পরাকাষ্ঠা । তারা ছিলেন নবীজির সুন্নতের বহিঃপ্রকাশ ।

কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ আমরা মুসলমানরা আজ বিভিন্ন মাযহাবে বিক্ষিপ্ত । মুসলমান জাতি আজ শিয়া সুন্নীতে দ্বিধা বিভক্ত । আবার সুন্নীদের রয়েছে চার মাযহাব । আসলে আমরা কি কখনো খুটিয়ে দেখেছি এ সুন্নী মাযহাবসমূহের আবির্ভাব কিভাবে হয়েছে ? এ বিষয়ে ইমামিয়া মাযহাবের কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি না টেনে বাংলাদেশের বহুল পরিচিত ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশনের’ প্রকাশিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান-ই যথাযথ মনে করছি । সেখানে এভাবে বলা হয়েছেঃ

“আব্বাসীয় আমলটা ছিল নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ । এই আমলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদ রূপ লাভ করে । সুফী ও শরীয়তের ইমামগন আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন । বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ হয় আরবীতে, গ্রীক দর্শন ইসলামী চিন্তার উপর গভীর ও সূদুর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে । এই সময়ের মধ্যেই ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও চিন্তা যে রূপ পরিগ্রহ করে, তাকে অনুসরন করেই শতাব্দির পর

শতাব্দি ধরে মুসলমান গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে । সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও নিচে আমরা সে সব অবস্থার রূপ ও পরিনতি কি হয়েছিলো তা দেখতে প্রয়াস পাব ।

দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের সময় ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইসলাসের অবিকৃত রূপ ও তার সমাজ ব্যাবস্থার পরিবর্তনের উপর মত প্রকাশ করেন । আবু হানিফার জনপ্রিয়তা ও প্রভাব দেখে মনসুর তাকে কুক্ষিগত করার প্রয়াসে বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করেন । আবু হানিফা (রহ.) এই প্রস্তাব অস্বীকার করায় মনসুর তাকে কারারুদ্ধ করেন, কারাগারেই আবু হানিফার মৃত্যু হয় । সুন্নী মতবাদের আরেক জন প্রচারক ইমাম মালেক (রহ.) কেও বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় । এই ভাবে কুরআন ও রাসুলুল্লাহর অনুসারী দু'জন শরীয়তের ইমামের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় । এই সময় মদীনায় খাটি ইসলামী চিন্তার দার্শনিক ও মর্মগত দিক ব্যাখ্যা করে বলেছেন ইমাম জা'ফর সাদেক (আ.) । হযরত আলীর (আ.) প্রপৌত্রের এমন ধর্ম ব্যাখ্যা মনসুরকে বিচলিত করল । মনসুর ইমাম জা'ফর সাদেকের রাজসভায় আহব্বান করে তাকে হত্যা করার সংকল্প করলেন । কিন্তু ইমাম জাফর সাদেকের সঙ্গে কথা বলে খলিফা যখন বুঝতে পারল যে, সাধকের প্রচেষ্টা প্রধানত সমাজ নয়, ব্যক্তিগত ও আত্মিক উৎকর্ষেরই তিনি প্রচারক, তখন ইমাম জা'ফর সাদেককে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়াই তার কাছে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয় । তবে মনসুর সেই সঙ্গে এ কথাও বুঝতে পারলেন যে, তার রাজবংশের স্থায়িত্বের জন্যে প্রয়োজন এক সুদৃঢ় মতবাদের । সেই মতবাদ কুরআন ও সুন্নাহকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করবে যা তার স্বার্থের প্রতিকুল নয় । তেমন মতবাদ তিনি তার অনুগত আইনজ্ঞদের দ্বারা করিয়ে নিলেন ও সেই মতবাদের নাম দিলেন সুন্নী মতবাদ । এই মতবাদের মধ্যে নবী বংশের দাবীর কথা যেমন নেই, তেমনই রাসূলুল্লাহর (সা.) ও তার অব্যবহিত দুই খলিফার সময়কার সমাজ ব্যবস্থার কথাও নেই । পরবর্তীকালে খলিফা হারুনুর রশীদের সময়ে সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি আবু

ইউসুফের নেতৃত্বে এক আইনজ্ঞ দলের সহায়তায় ইমাম আবু হানিফার নাম দিয়ে হানাফী মাযহাবের ধর্মীয় বিধি সুস্পষ্ট আকার ধারন করতে থাকে । তাতেও ব্যক্তিগত আচার অনুষ্ঠান ও এমন সামাজিক সমস্যা প্রাধান্য লাভ করে যাতে রাজবংশের স্থায়িত্ব ও সমাজের সামন্তবাদী প্রকৃতির পরিবর্তন করার কোন প্রচেষ্টার ইঙ্গিতমাত্র নেই । পরবর্তী মাযহাবগুলোকেও এমনি ভাবে রাজতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের পরিপোষক রূপে ছাটাই করে ছাড়পত্র দেওয় হয় ।[৭৯]

এখন দেখুন সুন্নী মাযহাবগুলো এমন সব জালেম রাজা বাদশাহরা তৈরী করেছেন যাদের কালো হাত রঞ্জিত হয়েছে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের ন্যায় আরো বহু জ্ঞানী গুনী ইসলামী ব্যক্তিদের রক্ত লালীমায় । আর আমরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলছি আর দাবী করছি নবীর সুন্নতের অনুসারী হিসেবে । তাই আজকে আমাদেরকে আহলে বাইতের তরীতে আরোহন করে ইহকাল ও পরকালের নাযাতের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন ।

আল্লাহর রশ্মি আহলে বাইত

মূলতঃ নবী করিম (সা.) এর ইন্তেকালের পর প্রায় দুই শতাব্দি কোন মাযহাবের অস্তিত্ব ছিল না । কেননা হযরত আবু হানিফার জন্ম ৮০ হিজরী সনে এবং মৃত্যু ১৫০ হিঃ তে সংঘটিত হয় । হযরত মালিক বিন আনাস (ইমাম মালিক) ৯৫ হিজরীতে জন্ম গ্রহন এবং ১৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন । হযরত মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী ১৫০ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন আর ২০৪ হিজরীতে পরলোক গমন করেন । হযরত আহমদ বিন হাম্বল হিঃ ১৬৪ সনে ভূমিষ্ট হন এবং হিঃ ২৪১ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন । আর আবুল হাসান আশ আরী ২৭০ হিঃ সনে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং ৩৩৫ হিজরীতে পরলোক গমন করেন ।

হানাফী মাযহাব সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে মুসলমানগন কোন মাযহাব অনুসরন করতেন ? নিশ্চয়ই চার মাযহাবের মধ্যকার কোন মাযহাবের অনুসরন করতেন না কেউ । পক্ষান্তরে আহলে বাইতরে ইমামগন রাসূলুল্লাহর অব্যবহিত পর থেকেই পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের ইমাম হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন সর্বাবস্থায় । আহলে বাইতের ইমামদের এ ধারাবাহিকতার কথাই ইমাম শাফেয়ী বলেছেন সাবলীল ভাষায়ঃ

وَ أمسَـــكتُ حَبـــلَ اللهِ وَ هُـــوَ وَلاءوهُـــم كَمـــا قَـــد أُمِـــرنَا بالتَمسُّـــكِ بالحَبـــلِ

অর্থাৎঃ আল্লাহর রশ্মি আকড়ে ধরেছি যা হচ্ছে তাদের ভালবাসা ও অনুসরন, কেননা এ রশ্মিকে আকড়ে ধরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।

আর আল কুরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)

অর্থাৎঃ তোমরা আল্লাহর রশ্মিকে শক্তভাবে আকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৮০]

বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন প্রকার বাক্যাবলীর মাধ্যমে আর বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) আহলে বাইতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং তাদের অনুসরন করার বিষয়টি পরিস্কার ভাবে উম্মতকে বুঝিয়ে দিয়েছেন । তাই আমরা আহলে বাইতের এ রশ্মি তথা আলী থেকে মাহদী পর্যন্ত বারজন ইমামের পদাংক অনুসরনের মাধ্যমে পেতে পারি সত্য ও আলোর পথের নিশানা । আর যারা আহলে বাইতকে আকড়ে ধরে থাকলো মহানবী (সা.) এর বাণী মতে তারা কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না । তিনি বলেন,

انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی إن تمسکتم بها لن تضلوا ابدا.....

অর্থাৎঃ আমি তোমাদের জন্য দু'টি ভারবাহী মূল্যবান বস্তু রেখে যাচ্ছি । একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব অপরটি আমার পবিত্র আহলে বাইত । যারা এ দু'টিকে শক্ত করে আকড়ে ধরে থাকবে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না ।.....[৮১]

পরিশিষ্ট

এক. নবীপাক (সা.) সকল সাহাবীদের মধ্যে হযরত আলীর মর্যাদা ও গুনাবলী সর্বাধিক বর্ণনা করেছেন। "আর রিয়াদ আন নাদেরা"-র লেখক বলেছেন, হযরত ওমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন, রাসূল (সা.) বলেছেনঃ

ما اكتسب مكتسب مثل علی، يهدی صاحبه الی الهدی.

অর্থাৎঃ আলীর ন্যায় কেউ এত বেশী মর্যাদা অর্জন করতে পারে নি। তার পদাংক অনুসরনকারীরা হেদায়েতের পথে পরিচালিত।[৮২]

এ ধরণের বর্ণনা বিভিন্ন গ্রন্থে সামান্য শব্দ ও বাক্যের তারতম্যসহ উল্লেখিত হয়েছে।[৮৩]

দুই. নবী (সা.) এর নিকট থেকে বহুল বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, "আদম সৃষ্টির পূর্বে আমি এবং আলী একত্রে আল্লাহর নিকট এক খণ্ড নূর হিসেবে অবস্থান করতাম। অতঃপর যখন আল্লাহ হযরত আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি সেই নূরকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করলেন। এক খণ্ড আমি এবং অপরটি আলী।[৮৪]

তিন. আল্লামা সুয়ূতি তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতঃ

(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.)

অর্থাৎঃ অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কতগুলো শব্দ (কালেমাত) শিখলেন, ফলে সেগুলোর মাধ্যমে তিনি তওবা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা গ্রহনকারী ও অনুগ্রাহী।[৮৫]

এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

و اخرج ابن النجار عن ابن عباس قال: سألت رسول الله (ص) عن الكلمات التى تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال: سأل بحق مُحَمَّد و على و فاطمة و الحسن و الحسين الا تبت على فتاب عليه

অর্থাৎঃ ইবনে নাজ্জার ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে ঐ শব্দাবলী (কালেমাত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যা হযরত আদম আল্লাহর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহন করেছিলেন যার ফলে তার তওবা কবুল হয়েছিল। নবী (সা.) প্রতিত্তোরে বলেনঃ আদম (আ.), মুহাম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইনের উছিলা ধরে আল্লাহর কাছে তওবা করেন, যার ফলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেন।[৮৬]

চার. বিভিন্ন প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি ও আলী একই বৃক্ষের দু'টি শাখা।

'মুসতাদরাক আস সহিহাইন' গ্রন্থে নিম্নলিখিতভাবে এ ধরনেরই একটি হাদীস লিপিবদ্ধ আছেঃ জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলেছেন, হে আলী, বিশ্বের অন্যান্য মানুষ পৃথক পৃথক বৃক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর আমি এবং তুমি একই বৃক্ষ থেকে সৃষ্টি।[৮৭]

পাঁচ. সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য অনেক হাদীস গ্রন্থসমূহ নবী (সা.) এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আলীকে নিজের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। সহি তিরমিযিতে উৎকৃষ্ট সনদসহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেনঃ একদা নবী (সা.) সাহাবীদেরকে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ইত্তোবসরে আলী এসে উপস্থিত হলে নবী (সা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আলী তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে (উভয় জগতে) আমার ভাই।[৮৮]

ছয়. সহি আল বুখারীতে 'সুলহ' অধ্যায়ে (كيف يكتب) 'কাইফা ইয়াকতুব' শীর্ষক পাঠে (বাব) বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

انت منی و انا منک

অর্থাৎঃ (হে আলী) তুমি আমা হতে আর আমি তোমা হতে ।[৮৯]

তথ্যসূত্রঃ

১. সূরা আল আসরা, আয়াত নং- ৭১ ।

২. হাদীসঃ اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم সুনানে আবি দাউদ, খণ্ড- ২ পৃঃ- ৩৪

৩. সূরা আল বাকারা, আয়াত নং- ২০১ ।

৪. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ৩৩ ।

৫. সূরা আর রাদ, আয়াত নং- ৭।

৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ১০৩ ।

৭. সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩ ।

৮. সহি তিরমিযি, খণ্ড- ২, পৃঃ ২৯৯, হাদীস নং- ৩৮০৭ ।

৯. সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩ ।

১০. সূরা আশ- শূরা, আয়াত নং- ২৩ ।

১১. আল কাশশাফ, খণ্ড - ৪, পৃঃ- ২২০, আল কাবির, খণ্ড- ২৭, পৃঃ ১৬৬; তাফসীর আল জামেয়া'লি আহকাম আল- কোরআন, কুরতুবী, খণ্ড- ১৬, পৃঃ- ২২ ।

১২. নুর আল আবসার, শাবলানজী, পৃঃ১০৪; আস সাওয়ায়েক আল মুহরিক্বা, পৃঃ ১৪৬; শারহ আল মাওয়াকেফ লি আয- যারক্বানী, খণ্ড- ৭, পৃঃ ৭ ।

১৩. আল মুসতাদরাক আল হাকেম, খণ্ড- ৩, পৃঃ ১৫১; আল আওসাত, তাবরানী, আরবাইনঃ নাবহানী, পৃঃ ২১৬ থেকে বর্ণনা করেছেন । যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ- ১৫০; তারিখে খোলাফা, পৃঃ ৩০৭; নূর আল আবসার, শাবলানজী, পৃঃ ১১৪ ।

১৪. আল ক্বামুস আল মুহিত্বলিল ফিরুযাবাদী, খণ্ড- ৩, ফাসল আল হামযা, বাব আল লাম, পৃঃ৩৩১, প্রিন্টঃ কায়রো, হালাবী ফাউন্ডেশন ।

১৫. সূরা আল কেসাস, আয়াত নং- ২৯ ।

১৬. সূরা আল আনকাবুত, আয়াত নং- ৩৩ ।

১৭. সূরা আল হুদ, আয়াত নং- ৪৫- ৪৬ ।

১৮. সূরা আল হুদ, আয়াত নং- ৭৩ ।

১৯. সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩৩ ।

২০. রুহুল মায়ানি, আলুসী, খণ্ড- ২৪, পৃঃ ১৪।

২১. প্রাগুক্ত

২২. তাফসীর আল কাশশাফ, খণ্ড- ৩, পৃঃ ২৬; ফাতহ আল ক্বাদীর, শাওকানী, খণ্ড- ৪, পৃঃ ২৮০।

২৩. আকরামাহ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ুনঃ

ক) আত তাবাকাতুল কোবরা, খণ্ড- ৫, পৃঃ ১৪১ ।

খ) মিযান আল এ'তিদাল, যাহাবী, তারজামাতে আকরামাহ ।

গ) আল মা'য়ারিফ, ইবনে কুতাইবা, পৃঃ- ৪৫৫, প্রিন্ট কোম ।

২৪. মিযান আল এ'তিদাল, যাহাবী, খণ্ড- ৩, পৃঃ ১৭৩, ৫৬২; আল ফাসল লি ইবনে হাযম, খণ্ড- ৪, পৃঃ ২০৫ ।

২৫. সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩২ ।

২৬. সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৩০ ।

২৭. সহি বুখারী, খণ্ড- ৩, পৃঃ ৩৪ ।

২৮. সূরা তাহরীম, আয়াত নং- ৪ ।

২৯. সহি বুখারী, খণ্ড- ৭, পৃঃ ২৮- ২৯ ।

৩০. তাফসীর আল কাবির, খণ্ড- ৩, পৃঃ ৪ ।

৩১. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ৬, পৃঃ১১৫; তাফসীরে তাবারী, খণ্ড- ২৮, পৃঃ ১০১; আত তাবাকাতুল কোবরা, খণ্ড- ৮, পৃঃ ১৩৫; সহি বুখারী, খণ্ড- ৩, পৃঃ ১৩৭; খণ্ড- ৪, পৃঃ ২২; সহি মুসলিম, কিতাব আত তালাক, হাদীস নং- ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪।

৩২. কামেল ফি আত তারিখ, খণ্ড- ৩ পৃঃ১০৫; আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ইবনে কুবাইবা, খণ্ড- ১, পৃঃ ৭১, ৭২, গবেষক আলী শিরী; আল ফুতুহ, খণ্ড- ২, পৃঃ ২৪৯ ।

৩৩. আদ দুররুল মানসুর, সূয়ুতী, খণ্ড- ৪, পৃঃ ১৯৮; মুশকিল আল আসার, খণ্ড- ১, পৃঃ ২৩৩ একই বিষয়ে শব্দের তারতম্য ভেদে বিভিন্ন হাদীস বিদ্যমান, দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ সহি আত তিরমিযি, খণ্ড- ১৩ পৃঃ ২৪৮; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ৬, পৃঃ ৩০৬; উসদুল গা'বা, খণ্ড- ৪, পৃঃ ২৯ ।

৩৪. মুসতাদরাক আস সাহিহাইন, খণ্ড- ৩, পৃঃ ১৪৭; সহি মুসলিম, খণ্ড- ৫, পৃঃ ১৫৪, মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ১, পৃঃ ৯; সুনানে বায়হাকী, খণ্ড- ৬, পৃঃ ৩০০ ।

৩৫. আদ দুররুল মানসুর, সূয়ুতী, খণ্ড- ৫, পৃঃ ১৯৯; তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড- ৩, পৃঃ ৪৮৩; মুসনাদ আত তাইয়ালীসি, খণ্ড- ৮, পৃঃ ২৭৪; মুসতাদরাক আস সাহিহাইন, খণ্ড- ৩, পৃঃ ১৪৭; সহি

মুসলিম, খণ্ড- ৫, পৃঃ ১৫৪, মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ১, পৃঃ ৯; সুনানে বায়হাকী, খণ্ড- ৬, পৃঃ ৩০০ ।

৩৬. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ৬১ ।

৩৭. সহি মুসলিম, খণ্ড- ৬, বাবে ফাযায়িলে আলী, পৃঃ ১২০, ১২১ ।

৩৮. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ৬, পৃঃ ৩০৪, ৩১৯ ।

৩৯. সহি মুসলিম, খণ্ড- ৭, পৃঃ ১২৩ ।

৪০. দুরারুস সিমতাইন, পৃঃ ২৩৯; উসদুল গাবা, খণ্ড- ২, পৃঃ ১২, খণ্ড- ৩, পৃঃ৪১৩, খণ্ড- ৪, পৃঃ২৯; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ১, পৃঃ১৮৫, খণ্ড- ৩, পৃঃ২৫৯, খণ্ড- ৬, পৃঃ১৯৮; তাফসীরে তাবারী, খণ্ড- ২২, পৃঃ৭ ।

৪১. সহি মুসলিম, খণ্ড- ২, পৃঃ২৬৮; বাবে ফাযায়িলে আহলে বাইত; মুসতাদরাক আস সাহিহাইন, খণ্ড- ৩, পৃঃ ১৪৭; তাফসীরে তাবারী, খণ্ড- ২২, পৃঃ৫ ।

৪২. সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং- ৫৫।

৪৩. তাফসীরে দুররুল মানসুর, খণ্ড- ২, পৃঃ- ২৯৩; তাফসীরে আল কাবির, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১৩; তাফসীরে তাবারী, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ১৬৫; তাফসীরে বাইযাভী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ১৬৫; তাফসীর আল কুরআনুল কারিম, শেখ মুহাম্মদ আব্দুহ, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৪৪২; তাফসীরে আল কাশশাফ, সূরা আল মায়েদার ৫৫ নং আয়াত ।

৪৪. তাফসীরে আল কাশফ ওয়াল বায়ান, আস সা'লাবী, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৭৪; ফারায়েদুস সমিতাইন, খণ্ড- ১, পৃঃ- ১৫৭, ১৯১, বাব ৩৯, হাদীস নং- ১১৯, ১৬২।

৪৫. সূরা ত্বাহা, আয়াত নং- ২৯- ৩২ ।

৪৬. তাফসীরে আল কাশফ ওয়াল বায়ান, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৭৪; ফারায়েদুস সমিতাইন, খণ্ড- ১, পৃঃ- ১৫৭, ১৯১; কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৩১৯; খণ্ড- ৭, পৃঃ- ৩০৫; মাজমায়ঃ হাইসামী, পৃঃ- ৮৮, ১০২; রিয়াদ আন নাদের, খণ্ড- ২, পৃঃ- ২২৭ ।

৪৭. সূরা আশ শুরা, আয়াত নং- ২১৪ ।

৪৮. সিরাহ আল হালাবী, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৩২১ ।

৪৯. উক্ত ঘটনা বিভিন্ন হাদীস বেত্তা তাদের স্ব- স্ব গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

তারিখে তাবারী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৬২- ৬৩; তারিখে কামেল, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪০- ৪১; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড১- , পৃঃ- ১১১; শারহে নাহজুল বালাগা লি ইবনে হাদীদ, খণ্ড- ১৩, পৃঃ- ২১০- ২২১; কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৩৯৬ ।

৫০. সহি বুখারী, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ; বাবে ফাযায়িলে আন- নাবী, বাবে মানাকিবে আলী, পৃঃ- ২৪; আসনা আল মাতালিব লি জায়রী, পৃঃ- ৫৩; তারিখে দামেস্ক লি ইবনে আসাকের, খণ্ড- ১ ; শাওয়াহিদ আত তানযিল, খণ্ড- ১, পৃঃ- ১৫ ।

৫১. সূরা ত্বাহা, আয়াত নং- ২৯- ৩২ ।

৫২. সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং- ৬৭ ।

৫৩. সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং- ৩ ।

৫৪. সহি মুসলিম, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৩৬২; মুসতাদরাক আল হাকেম, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১০৯; তারিখে ইবনে কাসির, খণ্ড- ৪, পৃঃ- ২৮১, ৩৬৮, ৩৭০; খণ্ড- ৫, পৃঃ- ২১, ২০৯; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ১, পৃঃ- ১১৮- ১১৯; সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৪৩, হাদীস নং- ১১৬; তারিখে ইয়াকুবী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪৩ ; তাবাক্বাত আল কুবরা, খণ্ড- ২, অংশ- ২, পৃঃ- ৫৭; সিরাহ আল হালাবী, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৩৯০; তারিখে তাবারী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪২৯; মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড- ৯, পৃঃ- ১৬৪; আস সাওয়ায়েক আল মুহরিক্বা, পৃঃ- ২৫ ; তারিখে দামেস্ক, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪৫ ; উসূল আল মুহিম্মা, পৃঃ- ২৪, নাজাফ; আনসাব আল আশরাফ, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৩১৫; খাসায়েস আল আমিরুল মু'মেনিন, নাসাঈ, পৃঃ- ৩৫- ৯৩; কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ৪, পৃঃ- ৫৩, হাদীস নং- ১০৯২ ।

৫৫. তারিখে ইয়াকুবী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ১২৩- ১২৬ ; সহি বুখারী, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১৯০ ; মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরেস্তানী, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৫৭; তারিখে তাবারী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৭৮ ; তারিখে খোলাফা, পৃঃ- ৪৩; আস- সিরাতুন নাবাবিয়্যা, ইবনে হিশাম, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৩৩১; তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড- ৪, পৃঃ- ১৯৬ ।

৫৬. আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ইবনে কুতাইবা, খণ্ড- ১, পৃঃ- ২১ ।

৫৭. ফাইযুল ক্বাদির শারহে আল জামেয়া আস সাগীর, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ৫২১ ।

৫৮. সহি মুসলিম, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৫১; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৫৭; তারিখে তাবারী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪৩৯ ।

৫৯. মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরেস্তানী, খণ্ড- ১ পৃঃ- ৭৫৭ । লিসানুল মিযান, খণ্ড- ১, পৃ- ২৬৭ । আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, ইবনে কুতাইবা, খণ্ড- ১, পৃঃ ৩০- ৩৩ ।

৬০. মুসনাদ তাইয়্যালিসি, পৃঃ- ২৫৯, হাদীস নং- ১৯১৩ । হিলইয়াত আল আউলিয়া, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ২২৪ । সহি মুসলিম, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ২২, খণ্ড- ১২, পৃঃ- ২১৪ ।

৬১. সহি তিরমিযি, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৩৬০ । উসদুল গাবা, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ৫৭৪ । সহি আল বুখারী, কিতাব বাদয়'আল খালক । তাবাকাত আল কোবরা, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪০ । মুসনাদ আহমাদ, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ২৮২ ।

৬২. ইয়ানাবিউল মাওয়াদদাহ, পৃঃ- ২৬০ । আল মুসান্নেফ, খণ্ড- ১২, পৃঃ- ১২৬, তিনি আইনাহ থেকে ইবনে আইনাহ হযরত ওমর থেকে আবার তিনি মুহাম্মদ বিন আলী থেকৈ বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সা.) বলেছেনঃ

انّما فاطمة بضعة منى فمن اغضبها اغضبنى

৬৩. সাক্বিফা ও ফদাক, আবি বাকর আহমাদ বিন আব্দুল আযিয জাওহারী ।

৬৪. আল মানাক্বিব, যামাখশারী, পৃঃ- ২১৩ । দুরারু বাহরিল মানাক্বিব, আশ শেইখ আল হানাফি আল মুসিলি পৃঃ- ১১৬ । আল আরবাইন, আল হাফেজ মুহাম্মদ বিন আবি ফাওয়ারিস, পৃঃ- ১৪ । ইয়ানাবিউল মাওয়াদদাহ, আশ শেইখ সুলাইমান, পৃঃ- ৮২ । মাক্বতাল আল হুসাইন, আল খাওয়ারেযমী, পৃঃ- ৫৯ ।

৬৫. সহি বুখারী, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৩ ।

৬৬. সহি বুখারী, খণ্ড- ৯, পৃঃ- ১০১, কিতাবুল আহকাম, বাব নং- ৫১, বাবুল ইসতিখলাফ ।

৬৭. সহি মুসলিম, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৩ ও ৪, মিসর প্রিন্ট, তিনি ৮০ টা সনদ সহ বিভিন্ন প্রকার শব্দের তারতম্যের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

৬৮. সহি আবি দাউদ, খণ্ড- ২, পৃঃ- ২০৭, কিতাব আল মাহাদী ।

৬৯. সহি আত তিরমিযি, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪৫ ।

৭০. মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৩৯৮; খণ্ড- ৫, পৃঃ- ৮৬- ১০৮ ।

৭১. মুসতাদরাক আস সাহিহাইন, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৬১৭, ৬১৮ ভারত প্রিন্ট ।

৭২. তারিখে বাগদাদ, খণ্ড- ১৪, পৃঃ- ৩৫৩, হাদীস নং- ৭৬৭৩; মুনতাখাব কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ৩১২ ।

৭৩. তারিখে খোলাফা, পৃঃ- ১০ ।

৭৪. আস সাওয়ায়েক আল মুহরিক্বা, পৃঃ- ১৮৯ ।

৭৫. ইয়ানাবিউল মাওয়াদদাহ, পৃঃ- ৪৪১; ফারায়েদুস সমিতাইন, খণ্ড- ২, পৃঃ- ১৩৩, হাদীস নং- ৪৩০- ৪৩১ ।

৭৬. কিফয়া আল আসার, পৃঃ- ৭ (পুরানো প্রিন্ট), কায়রো আল আসার, পৃঃ- ৫৩- ৬৯, প্রিন্ট ক্বোম ১৪০১ হিঃ ।

৭৭. ফারায়েদুস সমিতাইন, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৩১২, হাদীস নং- ৫৬২ ।

৭৮. ফারায়েদুস সমিতাইন, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৩১২; সহি বুখারী, খণ্ড- ৪, পৃঃ- ১৬৫; সহি মুসলিম, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৩- ৪; ইয়ানাবিউল মাওয়াদদাহ, আশ শেইখ সুলাইমান, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৩৪৯; খণ্ড- ২, পৃঃ- ৩১৬, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ২০৭, ২৯১; সহি আত তিরমিযি, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৩৪২; সুনানে আবি দাউদ, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৩০২; কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ১২, পৃঃ- ১৬৫ ; মাওয়াদ্দা আল কোবরা, পৃঃ- ২৯; মাক্বতাল আল হুসাইন লি খাওয়ারেযমী, পৃঃ- ১৪৬, হাদীস নং- ৩২০; তারিখে দামেস্ক, খণ্ড- ৭, পৃঃ- ১০৩; উসদুল গাবা, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ৫৭৪ । এ ধরণের আরো অনেক গ্রন্থে বার ইমামের নাম সহ প্রচুর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে । আশা করি সত্য গ্রহনকারীদের জন্যে উপরোক্ত কয়টি উদ্ধৃতি যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হবে ।

৭৯. কারবালা একটি সামাজিক ঘূর্ণাবর্তঃ মনির উদ্দিন ইউসূফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথমও দ্বিতীয় প্রকাশ যথাক্রমে ডিসেম্বর- ১৯৯২, পৃঃ- ১০- ১১ ।

৮০. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ১০৩ ।

৮১. সহি আত তিরমিযি, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ৬৬২, হাদীস নং- ৩৭৮৫, ৩৭৮৮, বাবে আহলে বাইতুন নবী, বৈরুত প্রিন্ট; সহি মুসলিম, খণ্ড- ৭, পৃঃ- ১২২- ১২৩, মিসর প্রিন্ট; মুসতাদরাক আল হাকেম, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১৪৮; কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৪৪; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ৫, পৃঃ- ১৮২- ১৮৯; আস সাওয়ায়েক আল মুহরিক্বা, পৃঃ- ১৩৫ ।

৮২. আর রিয়াদুন নাদেবরা, খণ্ড- ২ পৃঃ- ২১৪ ।

৮৩. মুসতাদরাক আস সাহিহাইন, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১০৭; আল ইসতিয়াব, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৪৬৬; আস সাওয়ায়েক আল মুহরিক্বা, পৃঃ- ৭২, ৭৬; আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, পৃঃ- ৯৩; তারিখে বাগদাদ, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ২২১; নূর আল আবসার, পৃঃ- ৭৩ ।

৮৪. আর রিয়াদুন নাদেবরা, খণ্ড- ২ পৃঃ- ১৬৪; মিযানুল এতেদাল, যাহাবী, খণ্ড- ১ পৃঃ- ২৩৫; তারিখে বাগদাদ, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৫৮ ।

৮৫. সূরা আল বাকারা, আয়াত নং- ৩৭ ।

৮৬. কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ১, পৃঃ- ২৩৪ ।

৮৭. মুসতাদরাক আস সাহিহাইন, খণ্ড- ২, পৃঃ২৪১ ; কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ১৫৪; যাখায়েরুল উকবা, পৃঃ- ১৬ ।

৮৮. সহি আত তিরমিযি, খণ্ড- ২, পৃঃ- ২৯৯;

এ ধরণের হাদীস নিম্ন লিখিত গ্রন্থাবলীতেও দৃষ্টি গোচর হয় ।

মুসতাদরাক আস সাহিহাইন, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১৪, ১১১, ১২৬; সুনানে ইবনে মাজা, পৃঃ- ১২; তারিখে তাবারী, খণ্ড- ২, পৃঃ- ৫৬, ৬৩; কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ৬, পৃঃ- ৩৯৪; আর রিয়াদুন নাদেবরা, খণ্ড- ২ পৃঃ- ১৫৫, ১৬৭, ২২৬, ৪০০; তাবাক্বাত আল কোবরা, খণ্ড- ৮, পৃঃ- ১৪, ১১৪; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ১, পৃঃ- ১৫৯, ২৩০; উসদুল গাবা, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ৩১৭; তারিখে বাগদাদ, খণ্ড- ১২, পৃঃ- ২৬৮; আস সাওয়ায়েক আল মুহরিক্বা, পৃঃ- ৭৪- ৭৫ ।

৮৯. এ ধরনের উক্তি আরো বহু হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে । তন্মোধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

সুনানে বায়হাক্বী, খণ্ড- ৮, পৃঃ- ৫; খাসায়েসে নাসাঈ, পৃঃ- ৫১; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড- ১, পৃঃ- ৯৮; মুসতাদরাক আস সাহিহাইন, খণ্ড- ৩, পৃঃ- ১২০; তারিখে বাগদাদ, খণ্ড- ৪, পৃঃ- ১৪০; সহি আত তিরমিযি, খণ্ড- ২, পৃঃ- ২৯৭, ২৯৯ ।

সূচীপত্র

অবতরনিকা 3

মানব জীবনে নেতার গুরুত্ব 5

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি 9

নবী (সা.) এর উত্তরাধীকার 11

নবীর আহলে বাইতের ভালবাসা 13

আহলে বাইত 17

আল্লাহ কর্তৃক হযরত আলীর মনোনয়ন 29

নবী কর্তৃক হযরত আলীর মনোনয়ন 32

গাদীরে খুমের ঘটনা 37

হযরত আবু বকরের খেলাফত লাভ 42

হযরত আবু বকরের খেলাফতের প্রতি মা ফাতিমার অস্বীকৃতি 45

হাদীস শরীফে বার ইমাম 48

ইসলামী মাযহাব ও তার বৈশিষ্ট্য 56

আল্লাহর রশ্মি আহলে বাইত 59

পরিশিষ্ট 61

তথ্যসূত্রঃ 64